

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

মাঘ ১৩৭৯



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পঃ বঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত

রোশনাই

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
মাঘ ১৩৭৯

প্রচ্ছদ
শৈল চক্রবর্তী

অলঙ্করণ ও অন্যান্য ছবি
সুব্রত ত্রিপাঠী
সুবোধ দাশগুপ্ত
বিমল দাস

সম্পাদিকা
গীতা দত্ত

এশিয়া মুদ্রণী কলিকাতা বারো হতে ছেপে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা বারো থেকে প্রকাশ করছেন মৃণাল দত্ত







ছোটদের ভৌতিক গল্প

কয়েকটি কিশোর উপন্যাস

কানামাছি
আনন্দ বাগচী ৫·০০

অমিয়র অ্যাডভেঞ্চার
ধীরেন্দ্রলাল ধর ৩·০০

পঞ্চাননের হাতি
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩.০০

প্রাণ নিয়ে টানাটানি
শিবরাম চক্রবর্তী ৩·২৫

ইটু পাটুর কাহিনী
মনোজিৎ বসু ৩·৫০

টুই টুই
শৈলেন ঘোষ ৩·০০

বাড়ী থেকে পালিয়ের পর
শিবরাম চক্রবর্তী ৪·৫০

লটারির লাল টিকেট
রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪·৫০

মণিমালা
লীলা মজুমদার ৩·৫০

পুবের সূর্য
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
সংগ্রামের উপর লেখা
শাহরিয়ার কবির ৫·০০

আজগুবী গল্প
গীতা দাস সম্পাদিত ৫·০০

সোনালী রূপকথা
বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ৪·০০

ভানুমতীর কৌটো
সরল দে সম্পাদিত ৩·৫০

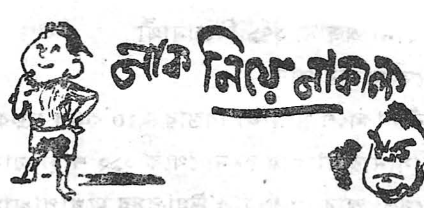
ছবি ছড়ার দেশে
শৈলশেখর মিত্র
সম্পাদিত ৪·৫০

সব সেরা গল্প
কার্তিক দাশগুপ্ত ২·৫০

সব সেরা গল্প
শিবরাম চক্রবর্তী ২·৫০

ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ
মনোজিৎ বসু ২·০০

রোশনাই বার্ষিকী ৩·০০



আরও কয়েকটি সেরা বই

গুপীগাইন বাঘা বাইন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
৩.০০

বিচিত্র বাঘ শিকার
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩.০০

জলে স্থলে
প্রেমেন্দ্র মিত্র ২.৫০

অজানারে
অমরনাথ রায় ২.৫০

লোহার ঘোড়া চালাল যারা
ইন্দিরা দেবী ২.৫০

রাইট ব্রাদার্স
সবুজ সাথী ২.০০

নাক নিয়ে নাকাল
শিবরাম চক্রবর্তী ২.৫০

ম্যাজিকের গল্প
অজিতকৃষ্ণ বসু ৫.০০

চিন্তাশীল বাঘ
শৈল চক্রবর্তী ৩.০০

শরীরটাকে গড়ে তোলো
আরবি ৪.০০

খেলাধুলার গল্প
আরবি ৩.০০

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা বারো ॥ ফোন ॥ ৩৪-২৩৮৬



নিয়ম-কানুন

'রোশনাই' শিশু ও কিশোরদের মাসিক পত্রিকা। প্রতি ইংরাজী মাসের এক তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যা—আশি পয়সা। বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নয় টাকা। নমুনা সংখ্যার জন্য আশি পয়সার ডাকটিকিট পাঠাতে হয়।

আশ্বিন [সেপ্টেম্বর] মাস থেকে রোশনাই'-এর বর্ষ শুরু। বছরের যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।

লেখা নকল রেখে পরিষ্কার করে নাম ঠিকানাসহ কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠাতে হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো কোনমতেই সম্ভব নয়। গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা ও ছবির সঙ্গে গ্রাহক সংখ্যা, বয়স ও ঠিকানার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

পত্রিকা না পেলে চলতি মাসের মধ্যে স্থানীয় ডাকঘরের মতামতসহ জানাতে হবে। চিঠিতে সব সময় গ্রাহক সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হয়।

চিঠিপত্র, টাকা-পয়সা, লেখা ও খবরাখবর পাঠাবার ঠিকানা : রোশনাই, এ ১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-বারো। ফোন : ৩৪-২৩৮৬।



১৩শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৭৯/ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

একটা তারিখ

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

একটা তারিখ রক্তে লেখা
ক্যালেণ্ডারের পাতায়।
মিছিল নামে সেই তারিখে—
শহর-নগর দিকে দিকে,
তীব্র সে এক দুঃসাহসে
বুকের ভিতর মাতায়।

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ—
বুকে মশাল জ্বালায়।
সেই মশালে দেখায় যে পথ,
দু'চোখ জুড়ে তীব্র শপথ
উঠছে জেগে ; ভীরুতা সব
সামনে থেকে পালায়॥

গোবর্ধনের প্রাপ্তিযোগ

শিবরাম চক্রবর্তী

কী যেন কাজে ভাইকে ল্যাজে বেঁধে হর্ষবর্ধনকে যেতে হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে—যেতেই এবার নোটিশটা নজরে পড়ল তাঁর। এর আগে পড়েনি কখনো আর।

'ছাখ্, ছাখ্, দেখেছিস?' নোটিশ বোর্ডটার দিকে গোবরার চোখে আঙুল দিয়ে দেখান। —'পড়ে ছাখ্।'

'বিজ্ঞাপন তো!' গোবরার মুখ বিকৃতি দেখা যায়—'পড়বার কী আছে?'

'অনেক কিছু। ইস্কুলের লেখাপড়ায় কী আর শেখায়? দুনিয়ার হালচাল জানা যায় কিছু? কিছু না। যা কিছু শেখার এই সব বিজ্ঞাপন দেখেই, এর থেকেই শেখা যায় জানিস?'

'তুমি ছাখো দাদা! তুমিই শেখো। তুমি শিখলেই হবে।' বিজ্ঞাপনসহ বিজ্ঞ আপন দাদাকেও যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

'কাল ওটা না দেখেই যা শিক্ষালাভ হয়েছে আমার না!' বলেই তিনি ফোঁস করে নিশ্বাস ফ্যালেন—'আগে দেখলে কাজ দিত। এখন খালি হাহুতাশ করা!'

কথাটা হেঁয়ালির মতন লাগে যেন গোবরার—'কী হয়েছিল কালকে?' সে জানতে চায়।

'আমাদের ঠাকুরমশাই দেশে গেলেন না কাল? তাঁর টিকিট কাটতে গেছলাম শেয়ালদায়…তখন যদি সামনের ঐ বিজ্ঞাপনটা আমার চোখে পড়তো…'

'তুমি অবাক করলে দাদা! শেয়ালদায় গিয়ে তুমি হাওড়ার বিজ্ঞাপন দেখতে চাও? যতই তোমার দূরদৃষ্টি থাক না দাদা। তা কি কখনো হতে পারে?' দাদার ইতিহাস আর ভূগোলে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সেটা সে না দেখিয়ে পারে না।

'সেই তো দুরদৃষ্ট আমার! তবে আর বলছি কী!' বলে তিনি গতকালের বৃত্তান্তটা বিশদ করেন।

সেখানেও টিকিট ঘরের সামনে ঠিক এই রকম ভিড়—এখানকার মতই লম্বা লাইন।

তিনি সেই কিউয়ের ভিড়ে গিয়ে ভিড়ছেন। একটা লোক এগিয়ে এলো অযাচিতই, এসে বলল, আপনি মোটা মানুষ, এর ভেতরে গিয়ে কষ্ট করবেন কেন? আমায় দিন, আমি আপনার টিকিট কেটে দিচ্ছি। নিজের টিকিট তো কাটতেই হবে আমাকে, যেতেই হবে ওর মধ্যে।

তিনি তার হাতে টিকি-টের টাকাটা দিয়েছেন। তারপরে কড়া নজর রেখে-ছেন তার ওপরে।

লোকটা ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। কিউয়ের ল্যাজ ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর। সেই ল্যাজ ধরে এগিয়ে চলেছে লোকটা। লাইনের ল্যাজা মুড়ো হু'দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মধ্যে ল্যাজে খেলে কোথায় যে লোপাট হলো তার পাত্তা পাওয়া চকিতের গেল না! নিমেষে হাওয়া!



না হয় হাজার টাকাই বায়না নিন

এই বলে দাদা আবার সেই বিজ্ঞাপনটার ওপর নজর দেন, সেখানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা, জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে এখনো—'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই রহিয়াছে, সাবধান!'

তারপর তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা ভাইয়ের ওপরে টেনে আনেন—'এর মানে বুঝলি এবার?'

'বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে তুমি অমন করে সন্দেহ ভরে আমার দিকে তাকাচ্ছো যে?' ফোঁস করে ওঠে সে 'আমি তোমার নিকটই আছি বটে কিন্তু কোনো চোর ছ্যাঁচোর নই—স্পষ্ট করে কই।'

'যে কথা আমি বলেছি? চোরামি ঠকামি করতে বুদ্ধি লাগে, সেই বুদ্ধি তোর ঘটে

কই? আর যে জন্যেই আমার এত ভয়! এই শহরের চতুর্দিকেই যত বদলোক—' হর্ষবর্ধনের বিস্তৃত বিবরণ—'অলিতে গলিতে পোস্টাপিসে ইস্টিশনে। শহরটার হাড়ে হাড়ে বদমায়েশি। পোস্টাপিসে যাও, কেউ না কেউ গায়ে পড়ে তোমার মানিঅর্ডার করে দিতে চাইবে। ইস্টিশনে গেলে ত কথাই নেই, সেখানে যত লোক টিকিট কেনার তালে ঘুরছে তাদের বেশির ভাগই টিকিট কেনার পাত্র না। ঐ রকম ভাব দেখাচ্ছে বটে কিন্তু কেউ তার নিজের টিকিট কিনবে না। পরের টিকিট কিনে দেবার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে তারা—একেকটা আস্ত জোচ্চোর। তাদের একটাকে কাটলে দুখানা বদমায়েশ বেরয়। এখানে যত ঘাঘী আর ঘুঘু আনাড়িদের শিকার করার ফিকিরে ঘুরছে, আমি দেখে, এমন কি না দেখেই এখান থেকে বলে দিতে পারি। এখন থেকে সাবধান।'

বলে হর্ষবর্ধন মুখখানা এমন ধারা করেন যে তাঁকে বিমর্ষবর্ধন বলে গোবরার ভ্রম হয়।

'তুমি কিছু ভেবো না দাদা। কেউ আমায় ঠকাতে পারবে, না। আমিও বড় সহজ পাত্র নই।' ভাই দাদাকে ভরসা দিতে চায়।

'হ্যাঁ পারবে না। তোর দাদকে, দাদার দাদা ঠাকুরদাকে পেলে ওরা ঠকিয়ে ছাড়বে। তোর আমার চেয়ে বড় বড় ওস্তাদকে ওরা ঘায়েল করছে হরবখৎ। চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—তাই করে বেঁচে রয়েছে ওরা। পারবে না।'

পারৎপক্ষে ওরা কত রকম পারে তার কতকগুলো দৃষ্টান্ত তিনি এনে খাড়া করেন তার পরে—! কেমন করে চকচকে পেতলকে সোনা বলে চালাতে আসে, রাস্তায় কুড়িয়ে অমন সোনা দানা কত রাস্তায় বিলিয়ে দিতে চায়, দশ টাকার নোটকে চোখের ওপর ডবোল করে দেখিয়ে দেয়, তিনখানা তাস ফুটপাতে বিছিয়ে কত রকমে কেরামতি করে—সেই কেরামতুল্লাদের কত রকমের রোমাঞ্চকর কাণ্ডকারখানা তিনি কাহিনী পরম্পরায় বর্ণনা করে যান, এক বর্ণও যার নাকি মিথ্যে নয়।

'মাও বলেছিল আমায়', গোবরা জানায়—'যাসনে কলকাতায়। সেখানে ধরে নিয়ে আসে, এই এখানেই নিয়ে আসে—আমাদের এই আসামে—এনে আসামের চা-বাগানে চালিয়ে দেয় নাকি! অচল টাকার মতন।'

'তোর মা তো সব জানে। আমার কথা শোন্।'—মার কথার ওপর তিনি নিজের কথা পাড়েন—'সে দিত আগে। চা-টা খাইয়ে, বাগিয়ে নিয়ে, চা-বাগানে চালান দিতো বটে! তার পর চা-বাগিচায় জন্মভোর খাটো খাও, চা বাগাও, খেটে মরো। সে সব ছিল আগে, কিন্তু এখনকার এ সব দৈত্য নহে তেমন। এরা তাদের ওপরে যায়। এরা তোকে আস্ত গিলবে আস্ত রেখেই বার করে দেবে কিন্তু তুই ভেতর-ফোঁপরা হয়ে যাবি। তোকে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে। গজভুক্ত কপিত্থ দেখেছিস? দেখিস নি? আমিও দেখিনি, তবে শুনেছি। গজরা আর বিদ্যাদিগ্‌গজরাই সে চীজ দেখেছে কেবল—সে ভারী ভয়ানক। দেখলে লোকে ভিরমি খায়।

এ সব ঠক জোচ্চোররা তোকে সেই কপিথ করে দেবে। কপির চেয়েও তা খারাপ নাকি, তাই বানিয়ে দেবে তোকে। কোথাও তোকে চালান না দিয়েই তোর যা কিছু সব আমদানি করে নেবে। তুই টেরটিও পাবি না। যদি পাস তো পাবি অনেক পরে, কিন্তু তখন পেয়ে আর লাভ?'

দাদার মুখখানা এক গাদা প্রশ্নপত্র নিয়ে দেখা দেয়, যার কোনো সদুত্তর গোবর্ধনের যোগায় না।

দাদার বলার পর থেকে দিনগুলো এমন ভয়ে ভয়ে কাটে যে! রাস্তায় বেরুলে সে ভয়ে ভয়ে হাঁটে, দেখে দেখে পা ফ্যালে, কি জানি কোনো আধুনিক ঠগীকে ভুলে মাড়িয়ে বসে। চারধারে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে। ঐ জাতীয় কিছু তার পিছু নিয়েছে কি না। কারু সঙ্গে একটা কথা কওয়ার তার সাহস হয় না। এমন কি পার্কে টার্কে যে সব প্রস্তর মূর্তিদের সাক্ষাৎ পায়, তাদেরো যেন তার বিশ্বাস হয় না তাদের কাছেও ফিসফিস করতে ভয় খায়।

আর প্রতিদিন বাড়ি ফিরে এসে দাদার কাছে তার নিরাপদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করতে হয়। ঠক জোচ্চোর দূরে থাক, পুলিস পাহারোলাকে পর্যন্ত এড়িয়ে সন্দেহজনক সব কিছুর পাশ কাটিয়ে কেমন করে ফিরে এসেছে, তার রোমাঞ্চকর ফিরিস্তি! ঠকদের ঠোক্কর খাওয়া দূরে থাক, কারুকে একটুখানি ঠোকরাতে অব্দি দেয় নি।

কিন্তু একদিন ভারী গোলে পড়ল গোবরা। বেড়াতে বেরিয়ে ফেরার পথে মোড় ভুল করে গুলিয়ে ফেলল রাস্তা। কাউকে ডেকে জিগেস করে যে পথের নিশানা জেনে নেবে সে ভরসা তার হয় না। যে পথ হারিয়েছে কেউ টের পেলে আর রক্ষে নেই। মা বলেছে চা-বাগানের কথা আর দাদা বলেছে টাকা বাগানোর ব্যাপার—দুটো কথাই বলতে গেলে এক কথা, সমান ভয়াবহ, বানানের সামান্য হেরফের মাত্র। তা বানানের এই তারতম্যে বানানো কোনো ব্যতিক্রম হবে না—বেচারী গোবরাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে—যে পথেই যাও।

সারা বিকেলটাই সে-পথে ও-পথে ঘুরে কাটালো, নিজের পথের কোনো কিনারা পেলো না। হঠাৎ তার খটকা লাগলো কেমন। কে যেন তার পিছু নিয়েছে না!

পিছন ফিরে দেখল তাকিয়ে—তাই ত! অনেকক্ষণ থেকেই তো ওই লোকটা তার আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করছে, কিছু যেন তাকে বলতে যায়!

আর যায় কোথায়! দেখেই হয়ে গেছে গোবরা। তারপর যতই সে তার নজর এড়াতে চায়, এদিকে যায় ওদিকে যায়, দিগ্বিদিকে কেটে পড়ে, ততই যেন লোকটাকে আরো আরো দেখতে পায়। কী সর্বনাশ!

গোবর্ধন টক করে এক মেঠায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঠন করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে এক ঠোঙা জিলিপি নিয়ে সামনের টেবিলে গিয়ে চিবুতে বসে যায়। ওমা! লোকটাও তার খানিক পরেই ঢুকেছে এসে সেখানে। আরেক ঠোঙা সিঙাড়া কচুরি নিয়ে বসে গেছে তার সামনে।

ঠক জুয়াচোর গাঁটকাটা নিকটেই আছে, সাবধান। বিজ্ঞাপনের কথাটা আর দাদার সাবধানী বাণী মিথ্যে না! ফাঁক পেলেই লোকটা এখন তার পকেট মারবে। যার পর নাই হালকা করে দেবে তাকে।

'আধাবয়সী লোকটা—কেমন তর যেন। গোবর্ধনের সামনে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারে আর অর্ধবিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাতে থাকে। যেন এমন আহামরি এর আগে আর কখনো সে ছ্যাখেনি জীবনে! এমন অস্বস্তি লাগে গোবরার। উস্‌খুস্‌ করতে থাকে।

আপনার মুখ যেন খুব চেনা চেনা ঠেকছে আমার। কোথাও যেন দেখেছি আপনাকে এর আগে?' কথা পাড়ে লোকটা।

'হুম্‌!' বলেই তুম্‌করে উঠে পড়ে গোবরা। এক ছুটে বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। বলতে বলতে যায়—মনে মনেই—আমার মুখ আগে দেখেছ বলছো তুমি। কিন্তু তোমার ঐ পোড়া মুখ আমি এ জন্মে দেখিনি। কিন্তু না দেখেও চিনতে পেরেছি তোমাকে···তুমি হচ্ছো একটি···আস্ত একটি···তা তুমি যাই হও, আর বেশি চেনাচিনির কাজ নেই, হাড়ে হাড়ে আর চিনতে চাইনে তোমায়। নমস্কার।

নমস্কার জানিয়ে সে দূরে সরে যেতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা তার অদূরেই থাকে। ছায়ার মতন তাকে অনুসরণ করে।

গোবরা নিরুপায় হয়ে একটা পার্কের চার ধারে তিন চক্কর মেরে তার ভেতরে ঢুকে একটা বেঞ্চির ওপরে বসে পড়ে। লোকটিও তার পাশে এসে বসে—সেই বেঞ্চেই।

এত ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে এত করে সে হারিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, তবুও লোকটার দৃষ্টি এড়ানো যায় নি। বৃথা আর সে দুশ্চেষ্টা না করে অসহায়ের মত সেই বেঞ্চিতেই জড়সড় হয়ে সভয়ে সে বসে থাকে। কী করবে?

বসেই না সে গাঢ় স্বরে ব্যক্ত করে—'আপনাকে আমি চিনতে ভুল করিনি ছোটবাবু। আপনি মিত্তির বাড়ির ছেলে, কলকাতার কে না আপনাকে চেনে। দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছি।'

ও বাবা! এ যে আবার মিত্র পক্ষ বলে ঠাওরায় আমায়। গোবর্ধন আঁতকায়। লোকটি যে নিতান্তই শত্রু পক্ষের তা বুঝতে তার বিলম্ব হয় না।

'স্বর্গীয় দিগম্বর মিত্তিরের ছেলে আপনি। চিনেছি আপনাকে।'

গোবরা চুপ করে থাকে। আপনি সম্বোধনে সে একটু খুশি হলেও আপনা আপনির সম্বন্ধটা তার ভালো লাগে না।

'এতক্ষণ ধরে তাই ত ভাবছিলাম, কেন এমন চেনা চেনা ঠেকছে আপনাকে। চিনতে পারলাম এতক্ষণে। আপনাদের সেরেস্তায় সেদিন গেছি, তখনই তো দেখেছি আপনাকে। বেশি দিনের কথা তো নয়।'

গোবর্ধন তার প্রতিবাদে কেবল না—না—না আওড়াতে পারে কোন রকমে।

কিন্তু লোকটা তার না-কারকে আমল না দিয়ে আরো নানা কথা কইতে থাকে—'আমার প্রস্তাবটা কি আপনি এর মধ্যে বিবেচনা করে দেখেছেন? আপনার বেলতলার বাড়িটা আমি কিনতে চেয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন ভেবে-চিন্তে পরে আমায় জানাবেন। আশা করি এখন আর আপনার কোনো অমত নেই?'

গোবর্ধন বলতে যায়—কিন্তু আমি তো মশাই···উক্ত চন্দ্রবিন্দু দিগম্বরের কোন দিগন্তেই যে সে নেই এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল গোবরা, এবং সুবিধে পেলে, ন্যাড়া নয় যে তাকে বেলতলায় যেতেই হবে পৈতৃক বাড়ির কেনাবেচায় নিতান্তই—এ কথাটাও সে জানাতো হয়ত কিন্তু কোনো কথাই সে কইতে পারল না।

সে সুযোগই তাকে দিলেন না ভদ্রলোক। কোনো কথা কানে না তুলে বলেই চললেন তিনি—'না, আপনার কোনো আপত্তি আমি শুনবো না। এখুনি কথাটার একটা নিষ্পত্তি আমি চাই। এই নিন পাঁচশো টাকা, ধরুন, আমার বায়না স্বরূপ এটাই আপাতত দিচ্ছি···না না, হাত নাড়লে হবে না, কোনো কথা শুনছিনে আপনার। বাড়িটার ওপর ভারী ঝোঁক আমার গিন্নীর, বুঝেছেন? আর অমত করবেন না দোহাই! না হয় হাজার টাকাই বায়না নিন, তারপর দামদর ঠিক করে যা হয় বিক্রি কবলার সময় চুকিয়ে দেবো আপনাকে। এখন এই হাজার টাকাই আমার কাছে আছে···দয়া করে টাকাটা নিন, কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাক।···

এই বলে ভদ্রলোক কোনো ওজোর না শুনে জোর করেই এক তাড়া নোট গোবর্ধনের হাতে গুঁজে দিয়ে, পাছে দিগম্বর তনয় মত বদলে নয় বলে ফেলে সেই ভয়ে, তক্ষুনি সেখান থেকে উঠে এক ছুটে পার্কের গেট দিয়ে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

গোবরা হাঁ করে বসে থাকে।

তারপর অন্যমনস্কের মত চলতে চলতে এক সময় নিজের বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছয়।

হাঁ করে বসেছিলেন হর্ষবর্ধনও—গোবরার প্রতীক্ষায়। হারিয়ে গেল নাকি ছেলেটা? নাকি, কোনো ছেলে ধরার পাল্লায় পড়ে গেল? প্রায় ওকে খরচ লিখতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃবর এসে হাজির।

'কোথায় ছিলিস এতক্ষণ?'

'একটু ব্যবসা বাণিজ্য করছিলাম দাদা।

'ব্যবসা বাণিজ্য? তোকে বার বার বারণ করে দিয়েছি না যে কোনো ধড়িবাজের পাল্লায় পড়তে যাসনে। যত সব ঘোড়েল লোক ছেলেছোকরা দেখলে ব্যবসা বাণিজ্যের নাম করে ফাঁদ পেতে ফাঁকি ফোকরা দিয়ে টাকা আদায় করে এখানে। শেয়ার বেচার কেরামতি

দেখিয়ে লাটে তুলে দেয় কোম্পানি। পই পই করে বলিনি তোকে? সাধ করে তুই তাদের খর্পরে পড়তে গিয়েছিস? কত টাকা ঠকিয়ে নিল শুনি? ক'শো টাকা গচ্ছা গেল?'

"গচ্ছা যায়নি তেমন, বরং কিছু গছিয়ে দিয়ে গেছে আমায়। ঠকিনি বিশেষ। তবে দাদা, একটা কথা বলবো? ঠকার চেয়ে না ঠকানো এখানে বেশি শক্ত—এই জ্ঞান আমার হয়েছে।'

'মানে?' হর্ষবর্ধন আরো একটু জ্ঞানলাভের পিপাসু।

'এইমাত্র আমি আমার বেলতলার বাড়িখানা বেচে—বেচিনি ঠিক এখনো—বেচার বায়না, বেশি নয়, এই হাজার খানেক নিয়ে আসছি। এই দেখো।'

এই বলে ফ্যানের হাওয়ায় ঘরের ভেতরে নোটের ঝুরি সে ওড়ায়।

'অ্যাঁ? শেষটায় তুই—আমার ভাই হয়ে—স্বর্গত শ্রীমৎ পৌণ্ড্রবর্ধনের পুত্র হয়ে—বর্ধনবংশের সন্তান হয়ে—তুই কিনা ঠক জোচ্চোর হলি? লোক ঠকাতে শুরু করলি শেষটায়?'

ভূরি ভূরি নোট তাঁর চোখের ওপর উড়ি-উড়ি আর তাঁর নিজের চোখ ভুরুর কড়িকাঠে।

একটা জোর জুয়াচোর তাঁর এত নিকটে—এমন কাছাকাছি—একেবারে বংশের মধ্যে এসে পড়বে, এ যেন তিনি ভাবতে পারেন নি। সেই ধারণাতীত দৃশ্য অবধারণ করেই তিনি হিমশিম খান।

'আমি ঠকিয়েছি কিনা ঠিক বলতে পারি না। তবে আমি লোকটাকে না ঠকাতেই চেয়েছিলাম। যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম দাদা। এমন কি এ কথাও বলেছিলাম দিগম্বর মিত্তিরের কোনো পুরুষের আমি কেউ নই। কিন্তু লোকটা আমার কথায় কানই দিল না, কী করবো?'

মুল্‌ক্‌-ই

প্রিয়দর্শী

অন্ধ্র আবার জ্বলছে। অসংখ্য জীবনহানি ঘটেছে ইতিমধ্যে। জাতীয় সম্পত্তির বিনাশ হয়েছে অশেষ। শুধু মাত্র রেল কর্তৃপক্ষের হিসেবে তাদের ক্ষতির পরিমাণ পনেরো কোটি টাকার বেশী। অশান্ত অন্ধ্রকে শান্ত করতে দিল্লী হায়দ্রাবাদ ছুটোছুটিতে নেতাদের ব্যস্ততা, দিল্লী হায়দ্রাবাদ যোগাযোগ রাখতে টেলি, ট্রাঙ্ক লাইনের ব্যস্ততা, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির আশ্বাস বচন ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে হয়েছে তবু ক্রোধের কিছু মাত্র কমতি হয় নি। জেদী ছেলের মত ফুঁসছে অন্ধ্র—না তেলেঙ্গানার সঙ্গে থাকবো না। অথচ এই তেলেঙ্গানাকেই ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরে তুলে নেবার দাবীতেই একদিন অন্ধ্র জ্বলে উঠেছিল।

পৃথক অন্ধ্র রাজ্য তৈরী হ'ল ১৯৫৪ সালে। তারই জের টেনে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নির্দেশে ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠলো বিভিন্ন রাজ্য। পুরোনো হায়দ্রাবাদের তেলেগুভাষী অঞ্চল তেলেঙ্গানা এলো অন্ধ্রে। সকল তেলেগুভাষী এলাকাকে এক রাজ্যে সংযুক্ত করে বিশাল অন্ধ্র গঠনের যে স্বপ্ন ছিল তার একটি সোপান রচিত হ'ল সেদিন।

কিন্তু মাত্র ষোলো বছর যেতে না যেতেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'ল কেন? আজ অন্ধ্র নিজেই নিজের অঙ্গচ্ছেদ চাইছে? বাহ্যতঃ, সেই কারণ হচ্ছে মুল্‌কি—মুল্‌ক্‌-ই-আইন।

তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন নয়। ব্রিটিশ ভারতে করদ রাজ্যগুলো যথেষ্ট শক্তিমান। আর সেই নৃপতিদের চুড়োমণি হায়দ্রাবাদের নিজাম। এদিকে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার চেতনা ধীরে ধীরে সংগ্রামী চেহারা নিচ্ছে। হায়দ্রাবাদের চতুর্দিকেও তার প্রভাব। এই মানুষের একাংশ খোদ হায়দ্রাবাদে ঢুকে সেখানকার অধিবাসীদের বুকেও সৃষ্টি করতে চাইল সেই উত্তাপ। ধুরন্ধর নিজাম সবই বুঝলেন। তাই সেই সম্ভাবনার শুরুতেই বাইরের লোকের অবাঞ্ছিত আগমন বন্ধ করতে চাইলেন। রচিত হ'ল মুল্‌ক্‌-ই আইন। ১৯১৮ সালের এই আইনে ঘোষণা করা হ'ল যে হায়দ্রাবাদের অনগ্রসর মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্যে চাকুরীর অধিকার সংরক্ষিত করা হ'ল। জন্মসূত্রে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা না হলে ওখানে চাকুরী মিলবে না। অবশ্য একটানা পনেরো বছর বসবাস করলে তারাও চাকুরীর দাবীদার হতে পারবে।

এই তো হ'ল আইন। এর ফলে, বাইরে থেকে যাদের আসবার আশঙ্কা রয়েছে তারা এলে তাদের বেকার থাকতে হবে। পরের বাড়িতে দীর্ঘদিন থেকে নিজাম বিরোধী আন্দোলন চালানো যায় না। প্রথমতঃ দীর্ঘদিনের জন্য পরের আশ্রয় সাধারণতঃ মেলে না। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী বাহিনীর কড়া নজরের কাছে বহিরাগত মানুষের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ ধরা পড়বে। এই দাওয়াইটি বাতলে নিজাম বাহাদুর তোফা আরামে রাজত্ব চালাতে লাগলেন। অবশ্য কোন ব্যবস্থাই চিরকালীন হয় না; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ সেখানেও ছড়িয়ে পড়ল। একদিন সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে, রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াই চালিয়ে তারা নিজামকে ধরাশায়ী করল—হায়দ্রাবাদ স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক অংশ হিসাবে স্বীকৃত হ'ল।

মুল্‌ক্‌-ই আইনের গোপন উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হ'ল বটে তবু আইনটি টি'কে রইল। ১৯৫১ সালে পার্লামেন্টে বিশেষ বিলের সাহায্যে আইনটিকে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। সেদিন কিন্তু প্রকারান্তরে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ অধিকারের নীতিটিকে মানা হ'ল।

১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রোয়েদাদ অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশে চলে এলো। সব

তেলেগুভাষী এক রাজ্যের সীমানায় বাঁধা রয়েছে—এ আনন্দে মেতে উঠলো গোটা অন্ধ্র। তারা পরিকল্পনা করলো বিশাল অন্ধ্রের—ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য তেলেগুভাষীদের এক অন্ধ্রের ভেতরে আনবার।

মুল্‌ক-ই আইন বজায় রইলো রাজ্য পুনর্গঠনের পরেও। একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হ'ল— তেলেঙ্গানা অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (গেজেটেড) চাকুরী ছাড়া অন্য সকল চাকুরী স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। এ ব্যবস্থা চলছিল ঠিকই। তবু একই রাজ্যে দুই সীমানা, একই ব্যবস্থায় দুই বিচার অনেকেই মেনে নিলেন না। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকলো, অবশ্য আগুন জ্বললো না কোথাও। বিক্ষুব্ধরা আদালতের শরণ নিলেন। বোম্বাই হাইকোর্ট বললেন—মূল্‌কই আইন ভারতীয় সংবিধান বিরোধী, কারণ চাকুরীতে সকলের সমান অধিকারের নীতিকে খর্ব করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ এই রায়ের ফলে বিরোধ আরও ঘনীভূত হ'ল। প্রতিবাদীপক্ষ এবারে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলেন। সেখানে ১৯৭০-এ বোম্বাই হাইকোর্টের রায় উলটে গেল। তাঁরা বললেন চাকুরীতে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমান অধিকারের নীতিটি সংবিধান স্বীকৃত বটে কিন্তু আঞ্চলিক অগ্রাধিকার সংবিধান বিরোধী হচ্ছে এ ধারণা সঠিক নয়; সংবিধানে কোন সুস্পষ্ট বাধা-নিষেধ আরোপ করা নেই।

এরপরই অবস্থা ঘোরালো হতে শুরু করলো। তেলেঙ্গানা দাবী করলো মুল্‌কই আইন পরিপূর্ণ কার্যকর করার। তারা রীতিমত আন্দোলন শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পাঁচদফা মীমাংসা সূত্র নির্ধারিত হ'ল। এই সূত্রে সাময়িকভাবে মুল্‌কই আইনকে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। স্থির হ'ল তেলেঙ্গানার জন্য নন গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ আঞ্চলিক অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এ ব্যবস্থা রাজধানী হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদে চলবে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, অবশিষ্ট অংশে এর মেয়াদ শেষ হবে ১৯৮০ সালে। তেলেঙ্গানাবাসীদের আরেকটি অভিযোগ ছিল রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের এলাকার যোগ ক্ষীণ। এ বিষয়েও একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

প্রধামন্ত্রীর পাঁচদফায় তেলেঙ্গানা শান্ত হ'ল, কিন্তু ক্ষেপে উঠল অন্ধ্র। তারা বললো—চাইনে সে ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে যারা আমাদের এত অবিশ্বাস করে। আন্দোলনে উত্তাল হ'ল গোটা অন্ধ্র। হরতাল, লুঠ, গুলি আগুন, ধ্বংস, আইন অমান্য, দলত্যাগ পর্যায়ক্রমে তুঙ্গে উঠছে আন্দোলন এই আগুনের মাঝখানেই সমাধানের সন্ধান করতে হবে। কেন না অন্ধ্র বিভাগ ভারতীয় সংহতির পক্ষে পরম বিপজ্জনক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছেন। মীমাংসার চেষ্টা চলছে। আগের জমাট বরফ কিছু গলেছে। সর্বশেষ খবর হ'ল আলোচনার বন্ধ দরজা খুলেছে। সারা ভারত গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে সেদিকে।



নারায়ণ চক্রবর্তী

॥ সাত ॥

বসন্তর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন কর্ণেল দত্ত। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মুখে কোনো কথা যোগাল না। শেষটায় বসন্তর একটা হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠলেন,—"এমন নিপুণ পর্যবেক্ষণ, ক্ষুরধার বুদ্ধি আর অপূর্ব বিশ্লেষণ কখনো দেখিনি মিস্টার লাহিড়ী। চমৎকার চমৎকার!"

ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত বললেন,—"তা হলে তো ইতিমধ্যে নকশা-চোর সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমরা জেনে ফেলেছি লাহিড়ী?"

"নিশ্চয়ই। আর যেটুকু বাকী আছে তাও জানতে পারবো কর্ণেল দত্তর হাউস স্টাফ্‌দের একে একে আমার সামনে এনে হাজির করলে আর ওদের থাকবার জায়গাগুলোতে একবার হানা দিতে পারলে। বসন্ত লাহিড়ীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না সে।"

কর্ণেল দত্তর মুখে তাকালেন ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত। বললেন,—"তা হলে আপনার হাউস স্টাফ্‌দের একে একে ডাকুন কর্ণেল।"

"আমার হাউস স্টাফ্?" ভুরু কুঁচকে বললেন কর্ণেল দত্ত,—"কিন্তু তারা সবাই যে পুরনো লোক আর খুবই বিশ্বাসী ব্রিগেডিয়ার,—দু'জন আবার সিক্রেট সার্ভিসের লোক।"

"তা হ'লেও ওদের জবানবন্দী নেওয়া দরকার কর্ণেল,"—বসন্ত বলল,—"কারণ নকশা চুরির ব্যাপারে যে বাইরের কোনো লোকের হাত নেই, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই।"

কর্ণেল দত্ত অসহায় ভাবে ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্তর মুখে তাকালেন। ব্রিগেডিয়ার দত্তগুপ্ত বললেন,—"আমি বলি কি, লাহিড়ীই যখন নকশা-চুরির কেসটা ইন্‌ভেস্‌টিগেট করছেন, তখন ওঁকে স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে দেওয়া উচিত কর্ণেল।"

"—আচ্ছা বেশ,—" ব'লেই উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন কর্ণেল দত্ত, "খড়্গ বাহাদুর—জলদি আও—"

নীচের তলা থেকে খড়্গ বাহাদুরের সাড়া পাওয়া গেল, সিঁড়িতে তার ভারী বুট জুতোর শব্দ উঠলো। কিন্তু সে ওপরে উঠে আসার আগেই লঘু ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকলো আর একজন। বসন্তর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো, কাছে গেল, গায়ের গন্ধ শুঁকলো।

আগেই তার ফটো দেখেছিল ব'লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল বসন্ত। নড়ল না সে। কাঠ হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

আদেশের সুরে কর্ণেল দত্ত বললেন,—"চুপ ক'রে বোসো টাগো, অসভ্যতা কোরো না—"

খাড়া কান অ্যালসেশিয়ানটা বাধ্য ছেলেটির মতো কর্ণেল দত্তর কাছে গিয়ে বসে পড়ল। লাল জিভ বার ক'রে অল্প অল্প হাঁপাতে লাগল। সামনের প্রসারিত পায়ের ওপর মুখ গুঁজে পিট্‌পিট্‌ ক'রে তাকাতে লাগলো।

বারান্দা দিয়ে কুইক্‌ মার্চ ক'রে ঘরে ঢুকলো খড়্গ বাহাদুর, এ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় স্যালুট করলো।

তার মাথার ওপর চেপে বসানো হ্যাটের দিকে একবার তাকালো বসন্ত। বলল,—"টোপী উতারো খড়্গ বাহাদুর—"

খড়্গ বাহাদুর কিন্তু নড়ল না, ছোট ছোট চোখে বসন্তর মুখখানা দেখে নিয়ে কর্ণেল দত্তর দিকে তাকালো। যেন অনুমতি প্রার্থনা করলো।

মাথা হেলালেন কর্ণেল দত্ত।

ঈষৎ অনিচ্ছার সঙ্গে ডান হাত তুলে মাথা থেকে টুপি নামিয়ে আনলো খড়্গ বাহাদুর।

তার বিরল কেশ মাথার মাঝখানে থাকা ছোটখাটো চকচকে টাক দেখেই মাথা নাড়ল বসন্ত। মৃদুস্বরে বলল,—"না, এ নয়। এর মাথায় তো চুল নেই বললেই হয়, তাছাড়া যা-ও বা আছে তা-ও হালকা রঙ এর।" খুস্কিও নেই মাথায়।"

তবু নিশ্চিত হবার জন্য একটা প্রশ্ন করলো বসন্ত,—"তুম কৌন তেল ইস্তেমাল করতা হ্যায় খড়্গ বাহাদুর? মাথাকে লিয়ে?"

আবার কর্ণেল দত্তর মুখে তাকালো খড়্গ বাহাদুর, তারপর সেখান থেকে সঙ্কেত পেয়ে নির্দ্বিধায় বলল,— "নারিয়েল কা তেল হুজুর। কে. এম. পি।"

"ঠিক হ্যায়, অব্‌ টোপী পিন্‌হো আউর মহাবীর সিংকো বুলাও খড়্গ বাহাদুর।"

খড়্গ বাহাদুর টুপি মাথায় দিল বটে কিন্তু নড়ল না সেখান থেকে। কর্ণেল দত্ত ঘাড় হেলালে পর আর এক দফা স্যালুট করলো তারপর এ্যাবাউট্‌ টার্ণ ক'রে মার্চ ক'রে বেরিয়ে গেল।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বসন্ত বলল—"কর্ণেল, আপনার এ লোকটি দেখছি আপনার অনুমতি ছাড়া নিশ্বাসটুকুও ফেলে না।"

হাসতে হাসতে কর্ণেল দত্ত বললেন,—"তা যা বলেছেন মিস্টার লাহিড়ী। সিক্রেট সার্ভিসে ওর মতো শৃঙ্খলাপরায়ণ লোক খুব কমই আছে। অসাধারণ ওর কর্তব্য জ্ঞান।"

কর্ণেল দত্তর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মহাবীর সিং ঘরে ঢুকলো, সবাইকে সেলাম ক'রে আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল বসন্ত।

মহাবীর সিং পালোয়ান লোক, কুস্তি করে ব'লেই হয় তো মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা। পরনে ধুতি, হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গায়ে গেঞ্জী। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা একটা চারকোনা চাকতি ঝুলছিল। ইয়া বড়ো গোঁপ, কালো কুচকুচে তেলতেলে শরীর।

আচমকা তার মাথায় হাত বুলালো বসন্ত। মহাবীর অবাক হয়ে গেল বটে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। হাতের তালুটা ভালো ক'রে দেখল বসন্ত, গন্ধ শুকলো। মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল,—"না, এ-ও নয়। মাথার চুল উঠে আসে নি, তা ছাড়া সরষের তেল মাখে মহাবীর সিং। কাজেই একেও সন্দেহ থেকে মুক্তি দেওয়া চলে কর্ণেল।"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল মহাবীর সিং। বলল—"কুছ্ কসুর ভইল বা মালিক?"

"জরুর কসুর হুয়া মহাবীর—"

"ও কৈসে মালিক?"

"সাব্ কা বাগিচা সে ইত্না আচ্ছা আচ্ছা ফুল খিলায়া, লেকিন দত্ত সাব্ কা সুত্নে কা ঘর ঠিক সে ঝাড়ু দিয়া নেহি কাহে?"

"ঝাড়ু তো দিয়া হ্যায় মালিক,—হর রোজ দেতানি।"

"দিয়া? দেখো তো খাট কা নীচে কিত্না ধুলা বা—"

তার প্রভু কর্ণেল দত্তর মতোই অনেক কষ্টে নীচু হয়ে খাটের তলাটা দেখলো মহাবীর। বসন্ত যেখানটায় ঝাঁটাটা রেখে দিয়েছিল তার পাশে প্রচুর ধুলোও দেখলো। লজ্জা পেয়ে বলল,—"কসুর মাফি হো যায় মালিক। গল্‌তি ভইল বা হমসে। অব এইসন্ কব্‌ভি না হোই।"

"কিতনা দিন সে কাম করতা হ্যায় হিয়াঁ?"

"পন্দর্‌হ্ সাল মালিক।"

"মুল্লুক কাহাঁ—"

"বলিয়া জিলা চন্দৌসী গাঁও—"

"ঠিক বা। অব্ তুম যাও। জগড়নাথ কে। ভেজ দো হিয়াঁ—"

"সেলাম, সেলাম—"

মহাবীর সিং চলে গেল। টাগো একবার উঠে দাঁড়াল, পিঠ বেঁকিয়ে আলস্য ভাঙলো, তারপর আবার ব'সে পড়ল।

বারান্দায় লঘু পদশব্দ উঠলো। দরজার দিকে তাকাল বসন্ত।

জগড়নাথ তার ঠোঁট থেকে তম্বুল রাগটুকু মুছে ফেলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও কৃতকার্য হয় নি। পরিষ্কার কামানো মুখ, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে থাকা লম্বা বাবরী চুল। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা খর্বকায় মানুষটি তার বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে বেশ ব্যতিব্যস্ত। পরনে খাটো মোটা ধুতি, খালি গা। গলা থেকে বেশ মোটা ধপধপে পরিষ্কার পৈতে ঝুলছিল। বেশ তেল কুচকুচে শরীর।

সাহেব লোকের সামনে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগল সে,—"মু কিচ্ছি জানে না. মু কিচ্ছি জানে না।"

আঙুল দিয়ে ওর চুল দেখিয়ে বসন্ত বলল,—"এত বড় বড় চুল রেখেছ কেন জগন্নাথ?"

"প্রভু জগন্নাথর মানত অছি, মানত অছি—"

"কতদিন কাজ করছ এখানে ?"

"বার বৎসর।"

তার মাথার চুল পরচুলা কিনা তা যাচাই করবার জন্য হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জগড়নাথের চুল ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল বসন্ত। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো জগড়নাথ।

"তুমি এবার যেতে পারো জগড়নাথ",—রুমালে হাত মুছে বসন্ত বলল, "ড্রাইভার হরিনাথকে পাঠিয়ে দাও।

আভূমি প্রণাম জানিয়ে দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল জগড়নাথ।

কর্ণেল দত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসন্ত বলল,—"এই ড্রাইভার হরিনাথও তো আপনার সিক্রেট সার্ভিসের লোক, তাই না কর্ণেল ?"

"হ্যাঁ। সামরিক পদ মর্যাদায় ও এখন সেকেণ্ড লেফটেনান্ট।"

"বিশ্বাসী ?"

"খুব বিশ্বাসী ! বহুদিন ধরেই অনেক গোপন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে সে

"এছাড়া আর কোনো হাউস স্টাফ নেই তো আপনার ?"

"না। আমার হাউস স্টাফ বলতে এই চার জনই। ইচ্ছে করেই ঝি রাখি নি আমি। প্রীতম সিং ছিল।" দিন দশেক হ'ল ছুটি নিয়ে গেছে সে।"

"তাই তো", বলে কিঞ্চিৎ বিমনা হ'ল বসন্ত। নকশা চুরিটা যে হাউস স্টাফদের মধ্যেই একজন করেছে এ থিওরীটা বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেখে বিমর্ষ হয়ে গেল সে। আনমনা ভাবে সিগারেট টানতে লাগল আস্তে আস্তে।

[চলবে]

হারানো শহর পম্পেই

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

'পম্পেই' কিংবা 'হারকুইলেনিয়াম' নামে কোন শহরের নাম শুনেছো নাকি তোমরা ?

ইতিহাসের পাতা উলটে দেখলে এই শহর দু'টির খোঁজ পাবে। নেপল্‌স উপসাগরের তীরে সারানো নদীর কোলে ছবির মত সাজানো স্বাস্থ্য নিবাস ছিল পম্পেই ; আর হারকুইলেনিয়াম ছিল এই পম্পেই-এরই শহরতলি ; কলকাতা আর দমদম যেমন অনেকটা সেই রকম আর কি ! ছোট বড়ো বাগানবাড়ি (বা 'ভিলা') আর স্নানাগারের জন্যে বিখ্যাত ছিল এই শহর দু'টি। প্রত্যেকটি বাড়ির দেয়াল আর মেঝেতে আঁকা থাকতো সুন্দর সুন্দর সব ছবি। অভিজাত রোমানেরা এক কালে অনেকেই এসে ভিড় জমাতেন এই শহরে। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ বিধাতার অভিশাপ নেমে এলো এই জনবহুল শহর দু'টির ওপর ! ইতালীর সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরি হচ্ছে ভিসুভিয়াস ; পম্পেই নগরীর পাশেই মেঘের মধ্যে মাথা লুকিয়ে এতকাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল এই পাহাড়। হঠাৎ ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো পম্পেই-এর সমস্ত মানুষ। বাড়ির বাইরে ছুটে বেরিয়ে এলো সবাই ; এসে দেখলে ধোঁয়া আর ছাই-এ ঢাকা পড়েছে চারদিক। পায়ের তলার মাটিও কাঁপছে থরথর করে। দীর্ঘ দিন পরে ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস আবার জেগে উঠেছে। তার গা বেয়ে ক্ষেত জঙ্গল পুড়িয়ে নেমে আসছে জ্বলন্ত লাভার স্রোত ! বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো ছিটকে পড়ছে আশেপাশে ! প্রাণ ভয়ে তক্ষুণি সবাই ছুটলো সমুদ্রের দিকে ; সেই ছোটাছুটির মধ্যে কত লোক যে পদদলিত হয়েই মারা গেল তার ইয়ত্তা নেই ! তাছাড় বাড়ি চাপা পড়ে, আগুনে পুড়ে কিংবা কাদামাটির নীচে হারিয়ে গেল হাজার হাজার মানুষ ! শোনা যায়, ভিসুভিয়াসের এই অগ্নিবর্ষণ চলেছিল একটানা আটাশ ঘণ্টা। তার ফলে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু লাভা-স্রোতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সাজানো শহর পম্পেই। আর হারকুইলেনিয়ামও চাপা পড়েছিল প্রায় ষাট ফুট গভীর কাদামাটির নীচে ! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল কলোসিয়াম (খেলাধুলার স্টেডিয়াম), পাথর-বাঁধানো পথ, চমৎকার সব 'ভিলা' আর স্নানাগার ! সেই সঙ্গে দোকান হাট, আঙুর-বাগান আর সাধারণ গৃহস্থের ঘর বাড়ি।

দু'চার জন যারা পালিয়ে বেঁচেছিল, তারা ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলো সেই বিভীষিকাময় দিনটিকে। ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলো লুপ্ত পম্পেইকে ! এই ভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক শো বছর। ততদিন পাথরের মত কঠিন লাভা স্তূপের নীচে একেবারে হারিয়ে গেছে ঐ শহর দু'টির নিশানা। অবশেষে ১৫৯৪ সালে সারানো নদীর ধারে একটা টানেল খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া

গেল একটা ভাঙা থাম আর এক আশ্চর্য সুন্দর ঘোড়ার মূর্তি। ঐ মূর্তির গায়ে খোদাই করা ছিল হারকুইলেনিয়ামের এক শিল্পীর নাম। তবু তখনই জায়গাটা ভাল করে খুঁড়ে দেখবার আগ্রহ হ'ল না কারও। এই ভেবে কেটে গেল আরও দেড়শো বছর। অবশেষে ১৭৪৮ সালে নেপল্‌স রাজের অনুমতি নিয়ে অলকুয়েরী নামে একজন ইনজিনিয়ার মাত্র চব্বিশ জন শ্রমিকের সাহায্যে শুরু করলেন খোঁড়াখুঁড়ি। কিন্তু কিছুদিন অনুসন্ধান চালানোর পর পয়সার অভাবে বন্ধ হয়ে গেল সেই কাজ। এরপর এগিয়ে এলেন স্বনামধন্য জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক উইন্‌কেলমেল। কয়েদীদের লাগালেন তিনি খোঁড়াখুঁড়ির কাজে। তাঁর চেষ্টায় আর পরিশ্রমে প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো ঐ দুই শহরের অনেক কিছুই দেখতে পেলাম আমরা। মাটি খুঁড়ে, পাথর সরিয়ে তিনি একে একে উদ্ধার করলেন পম্পেই আর হারকুইলেনিয়ামের কত না সম্পদ! এখন তোমরা কেউ যদি নেপল্‌স বেড়াতে যাও তবে পম্পেই আর হারকুইলেনিয়ামের সেই ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে ভুলো না। বিশেষ করে বিভিন্ন 'ভিলা'-র দেয়াল আর মেঝেতে আঁকা আশ্চর্য ছবিগুলো। আর মিউজিয়ামে রাখা সেকালের টুকিটাকি জিনিসের সংগ্রহ।



বুড়ো পৃথিবীটা কত বুড়ো?

আবদুল্লাহ আল-মুতী

আজ থেকে প্রায় তেইশ শো বছর আগে দুনিয়ার একজন মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল বলেছিলেন আমাদের চারপাশে প্রকৃতির সমস্ত অজানা রহস্যের মধ্যে 'কাল' বা সময় হচ্ছে সব চাইতে রহস্যময়। 'কাল' যে কী জিনিস, আর কী করে একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার কিছুই আমরা জানিনে।

সভ্যতার একেবারে আদি থেকেই এই 'কাল' মানুষকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। কখন থেকে সময়ের শুরু? কখন চারপাশের প্রকৃতি আর পৃথিবীর জন্ম হয়েছে? পৃথিবী আর আকাশের অজস্র গ্রহ-নক্ষত্রের কত বয়স? সূর্য কত দিন আর পৃথিবীর বুকে আলো ছড়াবে? এমনি অজস্র জটিল প্রশ্ন যুগে যুগে মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে।

ইরানের অতি প্রাচীন উপকথায় পাওয়া যায় পৃথিবীর বয়স হচ্ছে মাত্র বারো হাজার বছর। আবার প্রাচীন ব্যাবিলনে যে সব জ্যোতিষী আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ভবিষ্যৎ গুণে দিতেন, তাঁরা কিন্তু বলতেন পৃথিবীর বয়স এর চাইতে অনেক বেশী—আসলে এর বয়স বিশ লাখ বছরেরও ওপরে।

সে যাই হোক, ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলে এই সব কল্প-কাহিনী আর প্রাচীন জ্যোতিষীদের অলীক কল্পনার জায়গায় পৃথিবীর বয়স হিসেব করবার অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আজ জানা গিয়েছে। জ্যোতির্বিদ আর পদার্থবিদরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এ সব প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন।

সচরাচর কারো বয়স জানতে হ'লে আমরা তার জন্ম তারিখটা খুঁজে বের করি। পৃথিবীর যেদিন জন্ম হয়েছিল *সেদিন তার জন্ম তারিখ লিখে নেবার জন্য* কেউ হাজির ছিল না। খুব সম্ভব তখন পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত গ্যাসের একটা পিণ্ড।

পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে একটা মত হ'ল এক কালে পৃথিবী ছিল গনগনে আগুনের গোলা সূর্যেরই একটা অংশ। সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর পৃথিবী গরম গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ১৮৬২ সালে বিখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ উইলিয়ম টমসন (তাঁর আরেক নাম লর্ড কেল্‌ভিন) পৃথিবীর বয়স হিসেব করে বের করলেন চার কোটি বছর। সেদিন এই হিসেবই সবার কাছে বিরাট বলে মনে হয়েছিল।

তারপরে সুইজারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, সুইডেন এবং আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদরা অন্য আর এক দিক থেকে হিসেব করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা হিসেব করে দেখলেন, প্রতি বছর ঝড়-বৃষ্টি, নদীর পানিতে প্রায় এক কোটি টন ওজনের কাদা-মাটি-পাথর সমুদ্রের বুকে নিয়ে ফেলছে; আর এই ক্ষয়ের ফলে মহাদেশগুলো প্রত্যেক পঁচিশ হাজার বছরে প্রায় তিন ফুট করে নিচু হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর জন্মের একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড়ী জমির এই ক্ষয়; আর নিচু জমিতে স্তরের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এখন ষাট মাইলের ওপরে। এই বিপুল স্তর জমতে কত সময় লেগেছে তাই হ'ল তাঁদের পরীক্ষার বিষয়।

পানির স্রোত আর তুষারপ্রবাহে পাহাড় কিভাবে ক্ষয় হয় বিজ্ঞানীরা সে সব পরীক্ষা করে দেখলেন। প্রাচীন যুগের তুষার-স্রোত গেলে তার সাথে যে সব কাদা হ্রদের নিচে গিয়ে স্তরে স্তরে জমে শক্ত পাথর হয়ে গিয়েছে, সমুদ্র এবং মহাসমুদ্রের নিচে যে সব স্তর জমেছে, তাও তাঁরা পরীক্ষা করলেন।

এই সব পরীক্ষার পর তাঁরা বললেন, পৃথিবীর ওপরকার বিভিন্ন স্তর জমতে চার কোটি বছরের চেয়ে ঢের বেশী সময় লাগা দরকার। ১৮৮৯ সালে ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানী জোলি (Joyle) এইভাবে হিসেব করে বের করলেন, পৃথিবীর বয়স হচ্ছে তিরিশ কোটি বছর।

কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে একটা মস্ত বড় রকমের ফাঁক ছিল। জোলি ধরে নিয়েছিলেন সব পাহাড়-পর্বত প্রত্যেক বছর ঠিক একই হারে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। অথচ আমরা জানি, ব্যাপারটা আসলে মোটেই অত সুস্থির নিয়মমাফিক হয় না। কিছুদিন নিয়মিতভাবে পলি জমে স্তর পড়ে—তারপর একদিন বিরাট ভূমিকম্প হয়ে কিংবা বিশাল পর্বতশ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর নিয়মিত ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সাথে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা আকস্মিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। পর্বতশ্রেণী জেগে উঠলে আরো বেশি খাড়া নদী তৈরী হয়, তার স্রোতে আরো বেশি বেশি পাথরের টুকরো ইত্যাদি কঠিন বস্তু সমতল ভূমিতে কিংবা সমুদ্রের নিচে গিয়ে জমতে থাকে। এই সব কারণে জোলির হিসেবেও বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অতীতের সময়ের নিখুঁত হিসেব দিতে পারে এ-রকম একটা নির্ভরযোগ্য 'ঘড়ি'র তাঁরা খোঁজ করতে লাগলেন।

এবারে ভূতত্ত্ববিদদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন রসায়নবিদ্ আর পদার্থবিদ্‌রা। আর অবশেষে সেই আসল ঘড়ির খোঁজ তাঁরা পেলেন! একেবারে নিখুঁত, আদি ঘড়ি। সাধারণ ঘড়ি তৈরী করার জন্য কারিগর দরকার হয়, ঘড়িটা চালানোর জন্য চাই স্প্রিং, আবার একে চালু রাখবার জন্য মাঝে মাঝে চাবি দেবারও হাঙ্গাম আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই আজব ঘড়ির জন্য এ সব কোন ঝামেলারই দরকার নেই। অ্যাটম বা বস্তুর পরমাণুই হচ্ছে এই ঘড়ি!

আমাদের চারিদিকের সমস্ত দুনিয়ায়, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পরমাণু। এ সব পরমাণুর সবগুলো কিন্তু চিরদিন একই অবস্থায় থাকে না, এদের অনেকগুলো ক্রমাগত বদলে বদলে যাচ্ছে। একদিকে কিছু পরমাণু ক্রমাগতই ভেঙে যাচ্ছে, আরেক দিকে অনবরত নতুন নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে। সারা দুনিয়া জুড়েই পরমাণুর বুকে চলেছে এই ভাঙাগড়া, পরিবর্তনের লীলা।

আমাদের চোখের সামনেই ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম এ সব ভারি ধাতুর পরমাণু কেবলই ভেঙে পড়ছে—ভেঙে ভেঙে শেষ পর্যন্ত পরিণত হচ্ছে সীসেতে। এই ভেঙে পড়াকে কোনক্রমেই ঠেকাবার উপায় নেই; নক্ষত্রের বুকের ভেতরে বহু কোটি ডিগ্রী তাপে, দুনিয়াতে যত ঠাণ্ডা থাকতে পারে এ রকম চূড়ান্ত শীতে অথবা ভয়ংকর রকম চাপেও—এই ভাঙার কাজ আপন নিয়মে একটানা চলতে থাকে।

দুনিয়ার ওপর সারাক্ষণ আর সর্বত্র ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম এ সব পরমাণুর একটা নির্দিষ্ট অংশ ভেঙে পড়ছে—সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে হিলিয়াম বলে একটা গ্যাস, আর হিসেবমতো পরিমাণে সীসের পরমাণু। এই হিলিয়াম আর সীসেই জন্ম দিয়েছে আমাদের এই নতুন ঘড়ির!

সমস্ত দুনিয়াময় নানারকম পরমাণু ছড়িয়ে আছে—তাদের আবার অসংখ্য জাত। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম এ সব পরমাণু ওজনে ভারি, তাদের কেন্দ্রের গড়নও একটু

ঢিলে-ঢালা। এদের কেন্দ্র থেকে কেবলই বস্তু-কণিকা ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে—তার সাথে বিকিরণ হচ্ছে রশ্মি। সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর ঘটছে পরিবর্তন—এক পরমাণু রূপান্তরিত হচ্ছে অন্য পরমাণুতে।

সব পরমাণুর পরিবর্তন যে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই। এমন অনেক পরমাণু আছে যাদের পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে হয় যে, বহু কোটি বছরের মধ্যে এই পরিবর্তনের কোন লক্ষণই দেখতে পাওয়া যাবে না। কতকগুলো আছে যাদের আয়ু কয়েক শো কোটি বছর—কিন্তু এর মধ্যে তেজোরশ্মি বিকিরণ করে ক্রমে ক্রমে এরা বহু জটিল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। ইউরেনিয়াম-রেডিয়ামরা হচ্ছে এই গোষ্ঠীর। আবার কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন বা এক সেকেণ্ডের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় যাদের পরমায়ু এ রকম বিচিত্র পরমাণুও আছে।

পদার্থবিদ আর রসায়নবিদরা অনেক পরীক্ষার পর হিসেব করে দেখেছেন, এক হাজার গ্র্যাম (অর্থাৎ এক সেরের একটু বেশি) ওজনের ইউরেনিয়াম ধাতু যদি কোথাও রেখে দেওয়া যায় তাহলে দশ কোটি বছরে তা থেকে ১৩ গ্র্যাম ওজনের সীসে আর ২ গ্রাম ওজনের হিলিয়াম গ্যাস তৈরী হবে।

হু'শো কোটি বছরে সীসের পরিমাণ দাঁড়াবে ২২৫ গ্রাম (অর্থাৎ সমগ্র ইউরেনিয়ামের প্রায় চার ভাগের এক ভাগই সীসেতে পরিণত হবে) আর পাওয়া যাবে ৩৫ গ্র্যাম হিলিয়াম গ্যাস। রূপান্তরের কাজ অনবরত চলতে থাকবে। চারশো কোটি বছরে সীসের পরিমাণ হবে প্রায় ৪০০ গ্রাম, হিলিয়াম ৬০ গ্র্যামের কাছাকাছি পৌছবে—আর থাকবে প্রায় ৫০০ গ্র্যাম (অর্থাৎ আসলের মাত্র অর্ধেক) ইউরেনিয়াম ধাতু।

এমনিভাবে যদি আমরা দশ হাজার কোটি বছর পর্যন্ত এগিয়ে যাই, তাহলে প্রায় সব ইউরেনিয়ামই ভেঙে ভেঙে সীসে আর হিলিয়াম হয়ে যাবে! তখন পৃথিবীতে ইউরেনিয়াম আর থাকবে না বললেই চলে। তার বদলে সারা হুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকবে সীসের পরমাণু।

এই সব হিসেবের ওপর নির্ভর করে ভূ-বিজ্ঞানীরা গত ক'বছরে সারা হুনিয়ার জন্য সময়ের একটা মোটামুটি হিসেব তৈরি করেছেন। সাধারণ সীসে আর ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে যে সীসে হয় তাদের মধ্যে সামান্য একটু তফাত আছে —বিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় সেটা ধরা পড়ে। কোন পাথরে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের সঙ্গে কি পরিমাণের সীসে আছে তাই থেকে বিজ্ঞানীরা পাথরটার বয়স বের করেন। পৃথিবীর নানা জায়গায় সবচাইতে পুরনো পাথরের বয়স হিসেব করে পাওয়া গিয়েছে ২৬০ কোটি বছরের কাছাকাছি। এমনি পুরনো পাথর রয়েছে পৃথিবীর সব ক'টি মহাদেশেই।

পাথরের মধ্যে মাঝে মাঝে অভ্রের টুকরো পাওয়া যায়। খুব পাতলা কতকগুলো অভ্রের টুকরো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পরীক্ষা করলে অনেক সময় এদের মধ্যে সুন্দর রঙিন গোল চাকার মতো আভা দেখা যায়। তার কেন্দ্রে সব সময়েই থাকে খুব ছোট্ট একটা রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের কণা। এর ভাঙন থেকেই এই আভামগুলের সৃষ্টি। যতই দিন যায় এই রঙিন চাকার রঙ ততই গাঢ় হতে থাকে। চাকার আকার আর তাদের রঙ দেখেই বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন ওই অভ্রের টুকরো কত বছরের পুরনো।

আণবিক ঘড়ির এই সব পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে আমাদের পৃথিবীর বয়স মোটামুটি সাড়ে চার শো কোটি থেকে পাঁচ শো কোটি বছরের মধ্যে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শো কোটি বছর আগে সৌরজগতের জন্ম হয়েছে।

তিন শো কোটি বছর আগে তরল পৃথিবীর ওপর প্রথম কঠিন আবরণের সৃষ্টি হয়েছে—জন্মের পর এটা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৃথিবীতে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তারও প্রায় এক শো কোটি বছর পরে।

পৃথিবীর জন্মের কিছু দিন পরে অর্থাৎ এর ওপরকার স্তর কিছুটা শক্ত হয়ে ওঠার পর বিরাট বিরাট পর্বতশ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে ওপরকার কঠিন আবরণ যথেষ্ট পুরু হয় হয়নি। পৃথিবীর ভেতর থেকে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ বারে বারে ওপরকার এই আবরণকে ভেঙেচুরে ছিঁড়ে তছনছ করে দিয়েছে। ভেতর থেকে গলন্ত ধাতু আর লাভার স্রোত বেরিয়ে ওপরের কঠিন স্তরকে ঠেলে দুমড়ে মুচড়ে বিরাট বিরাট পাহাড়ের আকারে তুলে দিয়েছে ওপরে।

পৃথিবীর ওপরকার এই ভাঙাগড়ার বিরাট যুগের পর শুরু হ'ল জীব-জগতের ক্রমবিকাশের দীর্ঘ বিচিত্র ইতিহাস। একটি অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন করে প্রাণের প্রথম প্রকাশ ঘটে আজ থেকে প্রায় দু'শো কোটি বছর আগে। তার পরের ইতিহাস সেই আদি প্রাণকণার নানা বৈচিত্র্য আর সংঘাতের ভেতর দিয়ে মৃত্যুকে জয় করে ক্রমাগত এগিয়ে চলার ইতিহাস।

প্রাণের আবির্ভাবের পরও পৃথিবীর ওপরকার ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন থেমে থাকেনি ; সে পরিবর্তন আজো চলেছে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে উত্তর ইউরোপে ক্যালিডোনিয়ার বিরাট পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দেয়, বিশ থেকে তিরিশ কোটি বছরের মধ্যে উরাল পর্বতশ্রেণী আর তিয়েনশানের জন্ম হয়। পাঁচ থেকে আড়াই কোটি বছরের মধ্যে আল্পস্ পর্বতশ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছিল, ককেশাসের অগ্ন্যুৎপাত ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছিল, আর হিমালয় তার গর্বোন্নত শির ধীরে ধীরে তুলে ধরছিল পৃথিবীর বুকের ওপর।

তারপর এলো দুনিয়াতে পর পর কয়েকটি বরফের যুগ। আজ থেকে তিন-চার লাখ বছর আগে হ'ল দুনিয়াতে অতি আদিম ধরনের মানুষের আবির্ভাব। প্রায় পনের হাজার বছর আগে বরফের যুগ শেষ হয়। মিসর আর ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উৎপত্তি হয় আট থেকে দশ হাজার বছর আগে।

পৃথিবীর বয়স মাপার এই আশ্চর্য আণবিক ঘড়ি আজ বিজ্ঞানীদের নানা কাজে লাগছে। প্রকৃতির একটি গোপন কায়দাকে এবারে আয়ত্ত করা গিয়েছে—বুঝি এক হিসেবে সময়কে জয় করা হয়েছে। আজ যে কোন পাথর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা তার বয়স বলে দিতে পারেন। সে পাথর পৃথিবীর ওপর থেকেই আসুক আর চাঁদ বা অন্য কোন গ্রহ থেকেই আসুক।

দেয়ালের ঘড়ি তার গৎবাঁধা সুরে নিয়মিত গেয়ে চলেছেঃ টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্। যেন সে বলতে চায়ঃ বিরামহীন মহাকালের স্রোত বয়ে চলেছে একই ধারায়, অনন্ত অতীত থেকে কোন্ অজানা ভবিষ্যতের সন্ধানে!



[গত সংখ্যার পর]

কেতা দুরস্ত অ্যাকোয়ারিয়াম বানাতে গেলে লোহার (টিনের) পাতের অ্যাঙ্গেল দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে নিতে হবে। এ সব অ্যাঙ্গেল কিনতে পাওয়া যায় লোহালক্কড়ের দোকানে। মাপ ঠিক হবে চৌবাচ্চার আয়তন অনুসারে। অ্যাঙ্গেলের দু'পাশ এক সে. মি. থেকে দু'তিন সে. মি. চওড়া হতে পারে। পুরুত্ব এক মিলিমিটারের চতুর্থাংশ থেকে সোয়া মিলিমিটার। চৌবাচ্চা ছোট হলে অ্যাঙ্গেল হালকা হলেই চলবে। চৌবাচ্চা বড় করতে চাইলে অ্যাঙ্গেলও শক্ত পোক্ত হওয়া দরকার। দু'ফুট × এক ফুট × দশ ইঞ্চি মাপের অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য চাই মোট দশ ফুট অ্যাঙ্গেল। মিটারের মাপে সোয়া তিন মিটার (৩.২৫ মি.)। এবার অ্যাঙ্গেলটা থেকে ছটা এক ফুট আর দুটো দু'ফুট মাপের টুকরো বের করে নাও। ফ্রেমটা ঝালাই করে তৈরী করে নিতে হবে। এক ফুট মাপের চারটে অ্যাঙ্গেল হবে চারকোনার স্ট্যাণ্ড। বাকি চারটেতে (দু'টো এক ফুট ও দুটো দু'ফুট) নীচের ধরবার 'বেস'টা হবে। এই 'বেসের' (Base) অ্যাঙ্গেলগুলি মাটি থেকে দেড় দু'ইঞ্চি উপরে লাগাতে হবে। উপরের স্ট্যাণ্ডের প্রান্তগুলি চারটি সরল পাত বা অ্যাঙ্গেল দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। যদি অ্যাঙ্গেল বসাতে চাও, তবে আগে কাঁচের দেওয়ালগুলি বসিয়ে নিতে হবে। পাত দিয়ে ঠেকনা করলে অবশ্য দেওয়ালের কাঁচ পরে বসালেও চলবে। মনে রাখবে 'বেস' বা চৌবাচ্চার মেঝেটিও কিন্তু কাঁচেরই হবে। সুতরাং মাপসহ কাঁচের পাত লাগবে পাঁচটি (মেঝেতে একটা দু'ফুট × এক ফুট, চার দেওয়ালে দশ ইঞ্চি × এক ফুট দুটো আর দশ ইঞ্চি × দুফুট দু'টো এক্ষেত্রে)।

বেসটি কিন্তু খুব সাবধানে লেভেল হওয়া চাই। নচেৎ মেঝের কাচ পাতটি যখন তখন ভেঙে যাবার 'চান্স' থাকবে। ঠিকমত আঠা বা পুটিং ঢেলে কাচের পাতগুলি বসিয়ে দিতে হবে। বার বার জল ঢেলে পরীক্ষা করে নেবে কোথাও কোন 'লীক' বা 'ফুটো ফাটা' রয়ে গেল নাকি। এরপর ঢাকনীর ব্যবস্থা। টিনের একটি পাত কেটে পাশগুলি মুড়ে, ঝালাই করে অতি সহজে এটি তৈরী হবে। টিনের পাত আর মাপ দিলে সামান্য মূল্যে যে কোন ঝালাইওয়ালা এ কাজটি করে দেবে এমন কি একটি আলো লাগাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত।

পরিষ্কার বুঝতেই পারছ যে মাপগুলি দিয়েছি তা শুধু একটি বিশেষ মাপের অ্যাকোয়ারিয়াম-এর জন্যই। অ্যাকোয়ারিয়াম ছোট বড় হলে এ সব মাপেরও হেরফের হবে তাছাড়া জলের সব চাপটাই সহ্য করতে হয় কাঁচের দেওয়ালকে, তাই কাঁচগুলি পুরু আর ভাল হওয়া দরকার! ফ্রেমটাও একটু শক্ত হলেই ভাল হয়। এসব কাজে সর্বদাই অভিজ্ঞ লোকেদের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, কাজ করতে করতে বুদ্ধি আর কৌশলও বেড়ে যায়! লেখা পড়তে বা লিখতে যত সহজ কাজটা কিন্তু তত সহজ নয়—এ কথাটা মনে রাখা চাই।

চৌবাচ্চা তো হ'ল (কিনেই হোক বা বানিয়েই হোক)। সেটাকে এখন অ্যাকোয়ারিয়াম করে তোলা

জানা অজানা

॥ বিজ্ঞানার্থী ॥

দরকার। তার জন্য চাই জল, বালি আর গাছপালা। অ্যাকোয়ারিয়ামের উপযুক্ত জল হ'ল বর্ষাকালে বৃষ্টির জল। এরপর কোন পরিষ্কার পুকুরের জল। কর্পোরেশনের কলের জল বা টিউবয়েলের জলও ব্যবহার করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে জলটা একটু ফুটিয়ে নিলে ভাল হয়। জলটাকে দু'চার ফোঁটা মেথিলিন ব্লু আর একটু পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়ে ঘণ্টা কয়েক রোদে ফেলে রাখা উচিত। তাতে জলে যদি খারাপ ধরনের জীবাণু ইত্যাদি থাকে তারা মরে যায়। যদি ময়লা থাকে তবে জলটা ছেঁকে নিতে হবে।

বালির পক্ষে পুকুরের কাদা তুলে বার বার ধুয়ে ফেলে যখন আর ঘোলা জল বের না হবে নীচে চলে যাবে, এই অবস্থায় বালিটা সংগ্রহ করা হ'ল। এ ছাড়া যে কোন মাঝারি বা মিহি দানার বালি ব্যবহার করা চলবে। যেভাবেই বালি নেওয়া যাক না কেন, তাকে খুব ভাল করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে উনুনে বসিয়ে ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করে নিতে হবে। একটা দু'ফুট চৌবাচ্চার জন্য ১৫-২০ লিটার জল ধরে এমন বালতির এক-তৃতীয়াংশ বালি নেওয়া দরকার। অনেকে বালির ওপর পাথরের কুচি দিয়ে থাকেন। তা না দেওয়াই ভাল।

চৌবাচ্চার ভেতরটা প্রথমে ফ্রেঞ্চ চক গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মেজে নেওয়া দরকার। তারপর খানিকটা পটাশ পারমাঙ্গানেট গোলা জলে বার বার ধুয়ে ফেলতে হবে এবার। সেদ্ধ করা পরিষ্কার বালি যেটা খবরের কাগজে বা কাপড়ে রোদ রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে— সেই বালি প্রায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি (বড় চৌবাচ্চা হলে আরও বেশী) উঁচু করে পেতে দিতে হবে। বালির জমিটা হবে ঢালু। পিছন থেকে সামনে ক্রমশঃ নীচু হয়ে নামবে। এমনটি করা হয় যাতে ভবিষ্যতে চৌবাচ্চায় পড়া ময়লা সব গড়িয়ে সামনে আসে। এতে দেখতেও বেশ ভাল লাগে।

এবার, জল ঢালা। তার জন্য কয়েক ভাঁজ খবরের কাগজ বালির পর পেতে একটা কাঁচের গ্লাস বসিয়ে ঐ গ্লাসের গায়ে ধীরে ধীরে জল ঢালতে হবে। গ্লাসটা সামনে একটা কোনায় রাখা ভাল। এমনটি না করলে সব বালি এলোমেলো হয়ে যায়। জল ঢালার প্রকৃষ্ট পন্থা হ'ল সাইফন করে। জলের পাত্রটি অ্যাকোয়ারিয়ামের চেয়ে একটু উঁচুতে রাখা দরকার। তারপর একটি রবারের নল দিয়ে জল ফেলতে হবে! আরেকটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, দু'ফুটের চৌবাচ্চায় জল ধরে প্রায় ৫০ কিলোগ্রামের মত। সুতরাং জল ভরা চৌবাচ্চা মোটেই নড়ানো যাবে না। তাই যেখানে চৌবাচ্চা রাখা হবে সেখানে নিয়ে তবে জল ভরতে হবে।

বালির উপর চার পাঁচ ইঞ্চি জল জমলে কাগজটা সন্তর্পণে তুলে নাও। এখন গাছপালা যা দেবার তা বসাও। গাছপালাও দোকান কিনতে পাওয়া যায়। অথবা পুকুর থেকে তুলে আনা যাবে। পুকুর থেকে তুলে আনা গাছপালা সর্বদা পটাশ পারমাঙ্গানেটের জলে এক থেকে দু'ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা উচিত। অন্য যে কোন গাছ দেওয়া হোক বা না হোক 'জল-ঘাস' বা ওয়াটার গ্রাস' যার বিশেষ নাম 'ভেলিসনেরিয়া' সর্বদা দেবে। এ গাছ আমাদের দেশের জলায় বিস্তর মেলে। চার পাঁচ ইঞ্চি অন্তর

অন্তর এক একটি করে 'জল ঘাস' পিছনের দেওয়াল থেকে ইঞ্চি দুয়েক ছেড়ে বসিয়ে যাও। ছোট চৌবাচ্চায় ওয়াটার গ্র্যাস আর ঝাঁঝিদাম (মোলায়েম হওয়া চাই, নতুন মাছের গায়ে ঘষে ছড়ে যেতে পারে আর তা থেকে ঘা হওয়া বিচিত্র নয়) ছাড়া অন্য কোন গাছ না দেওয়াই ভাল। অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে তরোয়াল (অ্যামাজন সোর্ড), দু'এক রকম জলজ ফার্ণ, ক্রিপটোকোরিন প্রভৃতি।

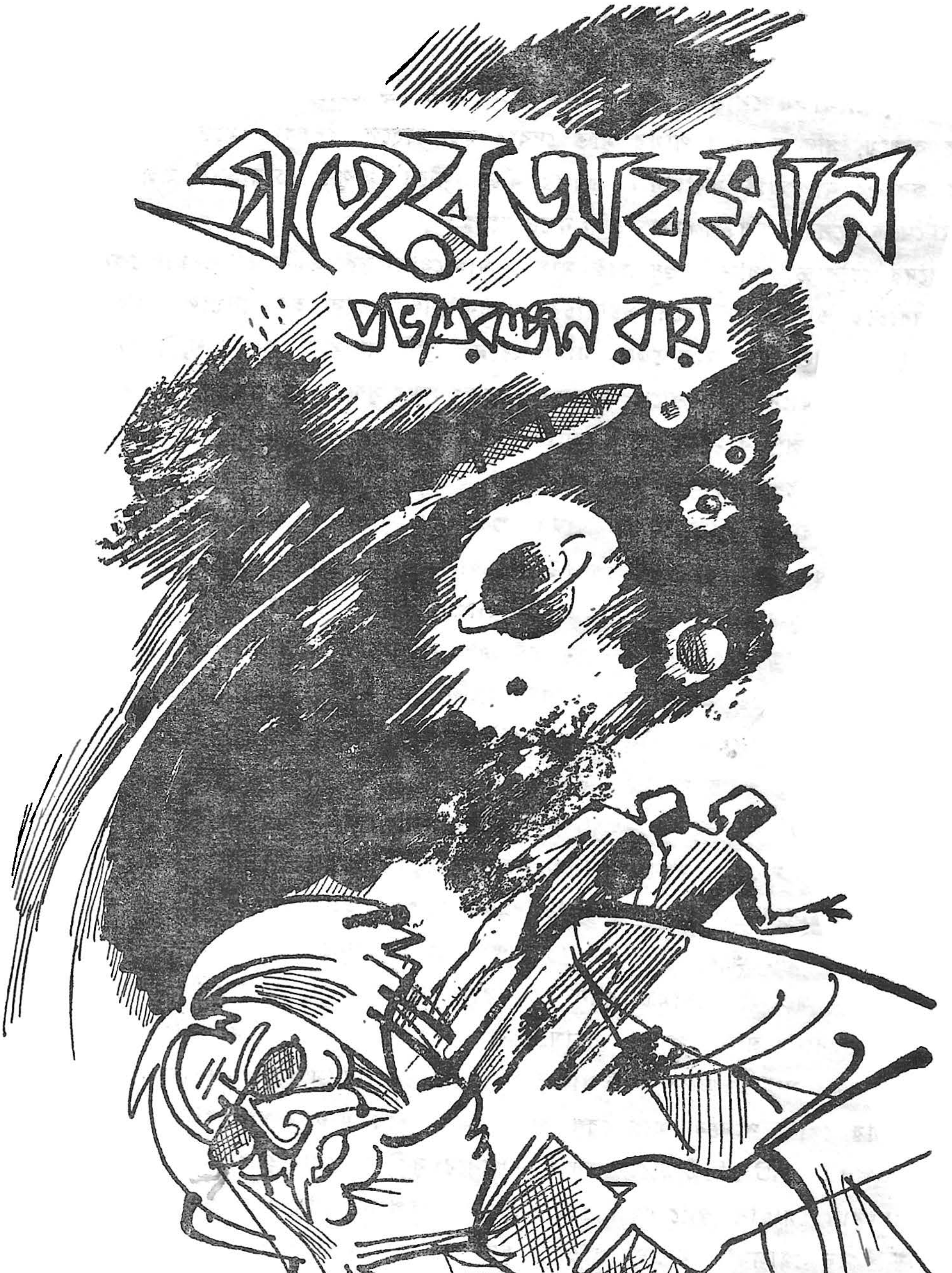
গাছ বসিয়ে, যদি দু একটা পাথর মূর্তি দেবার হয় তাহলে দেওয়া যেতে পারে। তবে ওসব বেশী রেখে জবরজং না করাই সমীচীন। এরপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটি জল পূর্ণ করে ফেলা হ'ল। কানা থেকে জলের উপরিতল যেন দু'ইঞ্চি নীচে থাকে।

আমাদের চৌবাচ্চা রেডি। শুধু চাই মাছ। মাছ যোগাড়ের একটা উপায় মাছ কেনা। এ বিষয়ে দোকানদার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। তবে সচারাচর যে সব মাছ পোষা হয় সেগুলো হ'ল গাপ্পি, মলি, তরোয়াল লেজ বা সোর্ড টেল, অ্যানজেল, নানা ধরনের পুঁটি বা বার্ব, ক্যাটফিশ, টাইগারফিশ, লড়াকু বা ফাইটার এই সব। আমাদের আশেপাশের জলাতেও অনেক সুন্দর সুন্দর মাছ পাওয়া যায়। আমি নিজে পুঁটি, খলশে, তেচোকা, মৌরলা, কাঠকৈ প্রভৃতি অনেক রকম মাছ ধরে এনে রেখেছি। তাছাড়া অন্যান্য দু'চার রকমের মাছ দেখেছি—মাছের সঠিক পরিচয় জানি না।

মাছের জন্য খাবার কিনতে পাওয়া যায়। শুকনো ও জ্যান্ত। এ দু'ধরনের খাবারই নিয়মিত দেওয়া উচিত। জ্যান্ত খাবারের মধ্যে আছে টিউবিফেক্স বা ছোট কেঁচো, ডাফনিয়া, মশার শূককীট প্রভৃতি। সকালে জ্যান্ত খাবার, বিকেলে শুকনো বা বিকেলে জ্যান্ত খাবার সকালে শুকনো এভাবে খাবার খাওয়ানো ভাল। জ্যান্ত খাবার রোজ সংগ্রহ করতে হয় এই এক ঝামেলা। অনেক দিন রেখে দেওয়া যায় না। পুকুরে-টুকুরে ডাফনিয়া পাওয়া যায়। আর কোন মাটির পাত্রে কিছু জল রেখে দিলে মশারা তাতে ডিম পাড়ে। দু'একদিনের মধ্যেই তা থেকে শূককীট হয়। একটি খুব সাবধান বাণী: খবরদার বেশী খাবার মাছকে দেবে না। এতে খাবার নষ্ট হয়, তলে গিয়ে পচে জলকে দূষিত করে। কম খাবারে মাছ মরে না, মরে বেশী খাবারে। দু-একদিন মাছেদের খাওয়া লক্ষ্য করলেই কতটা খাবার লাগবে সহজে জানা হয়ে যাবে। মাছেদের নানা রকম অসুখ হয়। অসুখ হলে মাছকে আলাদা করে ফেলতে হবে। এ জন্য একটি পৃথক বয়েম রাখবে। এছাড়া, অ্যাকোয়ারিয়ামে যে শুধু মাছই রাখতে হবে তার মানে নেই। যাঁরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে চান, তাঁরা মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণীর অ্যাকোয়ারিয়ামও গড়ে থাকেন। সে সবও দেখতে মন্দ হয় না। অ্যাকোয়ারিয়ামটি এমন স্থানে রাখা দরকার যেন বেশ স্থিতিশীল থাকে। নয়নাভিরাম হয়। আর মাঝারি ধরনের আলো পায়। সরাসরি আলো না পড়ে। শীতকালে সকালে বিকালে কয়েকঘন্টা আলো দিলে ভাল হয়। সাধারণ ভাবে একটি মাছের জন্য গড়ে তিন-চার মিটার জায়গা হিসাবে মাছ রাখা ভাল। দু'ফুটের চৌবাচ্চায় গোটা পনেরো মাছ বেশ রাখা যায়। তবে মাছ রাখার ব্যাপারে জরুরী হ'ল জলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল। সেটি প্রতিটি মাছের জন্য গড়ে পনেরো কুড়ি বর্গ সেমি হলে ভাল।

একটি সাজান গোছান অ্যাকোয়ারিয়াম যেখানে গাছপালা আর মাছ চমৎকার সহাবস্থানে থাকে, যাতে খুব কম কোন গোলমাল থাকে—শ্যাওলা ধরে না, মাছ মরে না ইত্যাদি—তাকে বলে সুসমঞ্জস বা ব্যালান্সড অ্যাকোয়ারিয়াম। আশা করি তোমাদের অনেকেরই হাতে গড়া সুসমঞ্জস অ্যাকোয়ারিয়াম তোমাদের প্রকৃতি পাঠের আনন্দরাজ্যে নিয়ে যাবে।

একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ॥



॥ আট ॥

জয়প্রকাশ আমাদের এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে থাকতো। দুর্যোগের প্রথমদিকে টেলিফোনে ওর কাছ থেকে খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের টেলিফোনের লাইন খারাপ হয়ে পড়াতে, আর কোন খবর পাওয়া সম্ভব হয় নি। আমাদের এদিককার ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছিল, খুব সম্ভব হাইটেনসন লাইন ছিঁড়ে গেছে। বাইরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ, সম্ভবত ঐ একই কারণে বন্ধ হয়ে গেছিল। ইলেকট্রিক লাইন ছিঁড়ে যাবার জন্য আমাদের বেতারও অচল হয়ে পড়েছিল। রাতটা গভীর অন্ধকারে কাটাতে হবে বলে ভাবনা হচ্ছিল। কারণ যদিও সবে পূর্ণিমা গেছে, তবু আকাশের ঐ ঘনঘোরে চাঁদের আলো কোনোমতেই পৃথিবীতে পৌঁছবে না। ঐ সর্বনেশে গোলকটা অস্ত যাবার আগে পর্যন্ত যেটুকু আলো আসবে সেইটুকুই যা ভরসা।

আমাদের কপাল এক হিসাবে ভালই বলতে হবে, কারণ এই দুর্যোগে আমরা বড়রা প্রায় সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম. কিন্তু অল্পবয়সী কয়েকজন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিল। তাদেরই মনে পড়েছিল যে আমাদের গবেষণাগারের গুদামঘরে গোটা কয়েক ছোট ছোট জেনারেটার তোলা রয়েছে। সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে গুদাম থেকে সেগুলো বার করে এনে চালু করার চেষ্টায় তারা লেগে গেল। ওরা আরেকটা সুখবর দিল যে, যে-পাহাড়ের তলায় তেলের আড়ত করা হয়েছিল সেটার কোনো ক্ষতি হয় নি। যদিও পাশের পাহাড়টা থেকে প্রকাণ্ড একটা ধ্বস নেমে পাহাড়ের ওপারের রাস্তাটা একেবারে বন্ধ করে ফেলেছে। ঐখানটাতেই আমাদের মোটর গ্যারাজ ছিল। অর্ধেকের ওপর গাড়ি পাথর আর মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। সব থেকে খারাপ খবর হ'ল যে, ঐ পাহাড়ের নিচেই আমাদের নিউক্লিয়ার জেনারেটারটা ছিল। সেটাও ঐ পাথরের স্তূপের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে। আর এ জন্যই এখানকার সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছিল।

আমাদের শহরের সব ইলেকট্রিক তার মাটির নিচে। কাজেই সেই তার ছিঁড়ে না থাকলে, ডাইনামো চালু করার পর আলোর অভাব হবে না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দুটো ডাইনামো চালু হয়ে গেল। কাছাকাছি কয়েকটা বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে বোঝা গেল যে অন্ততঃ এখানকার তারগুলো অক্ষত রয়েছে। রাত্রে আলোর অভাব হবে না।

মাটির কাঁপুনি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় মাথায় করে আবার দুজন সাহস করে গ্যারাজে গিয়ে দুটো গাড়ি নিয়ে এলো, এগুলো অনেকটা সেই পুরাকালের জীপ গাড়ির মতন। পাকা রাস্তা

না হলেও এবড়ো খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে বেশ চালানো যায়। আবহ একটু ভাল হলেই চারদিক ঘুরে আশে পাশের অবস্থা দেখতে হবে। এদিকে আকাশের ঘোর বেড়েই চলেছিল। ঝড়ের তেজ এমন যে গাছের ভাঙা ডালপালা, ছোট বড় পাথরের টুকরো সব খোলাম কুচির মতো উড়ে চলেছিল। এর ওপর আবার ধুলোয় সব ঢেকে যাচ্ছিল, ফলে আবার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিতে হ'ল।

ডাইনামোর ক্ষমতা কম, সেজন্য শহরের সকলকেই দু' একটার বেশি বাতি জ্বালাতে বারণ করা হ'ল। ঘরের ভিতরে অন্ততঃ একটা বাতি টিমটিম করে জ্বলছে, এটাই মস্ত বড় একটা সান্ত্বনা। সেটা না থাকলে, এ ঘোর অন্ধকারে সারারাত শুধু ঝড়ের শব্দ শুনেই কাটাতে হ'ত।

সারাদিনটা বিশ্রী শুকনো গরমে ঝলসাতে হয়েছিল। ঐ ঝড় থাকা সত্ত্বেও গরম একফোঁটাও কমেনি। সারাদিন শুধু জল খেয়েও মনে হচ্ছিল যে শরীরের সমস্ত রস একেবারে শুকিয়ে গেছে। জিভ শুকনো, গলার ভিতরটা এমন জ্বালা করছিল যে কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। খাবার জলের অভাব নেই এইটুকুই যা ভরসা। সমস্তক্ষণ শুধু মনে হচ্ছিল যে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বসে থাকতে পারলে হয়তবা ঐ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেতো। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা তো অসম্ভব। মনে ভয় হচ্ছিল যে সারারাতটাও যদি ঐ রকম থাকে, তাহলে পরের দিন আমাদের সকলের কি অবস্থা হবে। সামান্য কিছু করার ক্ষমতাও যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছিলাম।

নাম মাত্র রাতের খাওয়া হ'ল। এক এক গ্রাস গিলতেই কি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল যে কি বলবো। ঐ শুকনো গলা দিয়ে কোনো খাবারই নামতে চাইছিল না। জোর করে গিলতে গেলে বিষম লাগছিল, গলা যেন চিরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। সকলেই কোনোমতে দু' চার গ্রাস খেয়ে উঠে পড়লাম। কারো শরীরই আর বইছে না দেখে সকলকেই শুয়ে পড়তে বললাম। যদিও বিছানা আগুনের মতো গরম, তায় আবার ধুলো বালি ভাঙা কাঁচের টুকরোতে ভর্তি। একটু যে ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে নেবো সে ক্ষমতাটুকুও যেন সবাই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

পরের দিনটাও সেই একই ভাবে কেটে গেল। সেদিন বেশির ভাগ সময়ই আমরা নির্জীবের মতো বিছানায় পড়েছিলাম। বিকেলের দিকে দু'চারজন কোনোমতে উঠে, একটু খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু সে রাতেও বিশেষ কারো খাবার সামর্থ্য ছিল না। সেই আগের রাতের মতো কোনোমতে দু'চার গ্রাস খেয়ে, আবার সকলে শুয়ে পড়েছিলাম।

রাতে সকলেরই একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। মাঝরাতে দু'চারবার ভূমিকম্পও হয়েছিল। কিন্তু তখন আমরা বিছানা ছেড়ে উঠবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিলাম, এরপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা কেউ জানতে পারি নি। সকালের দিকে যখন ঘুম ভাঙল, তখন বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল।

তাড়াতাড়ি সকলকে ডেকে তুলে ঐ বৃষ্টির মধ্যে সবাইকে নিয়ে বাইরে গেলাম। বৃষ্টির

জল ঠাণ্ডা। গায়ে জল পড়লে যে এত আরাম লাগতে পারে, সেটা এর আগে জানতাম না। গায়ে জল পড়তে লাগল আর মনে হতে লাগল যেন সমস্ত শরীর জল শুষে নিচ্ছে। শরীরের যত অবসাদ আর গ্লানি সব যেন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। এইভাবে আধঘণ্টা ধরে জলে ভেজার পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। তখন সকলেরই খিদে পেয়ে গেল। গত দু'দিন তো কারোর কিছু খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। মনের আনন্দে সকলে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে কাপড়চোপড় বদলিয়ে, পেট ভরে খেয়ে নিয়ে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

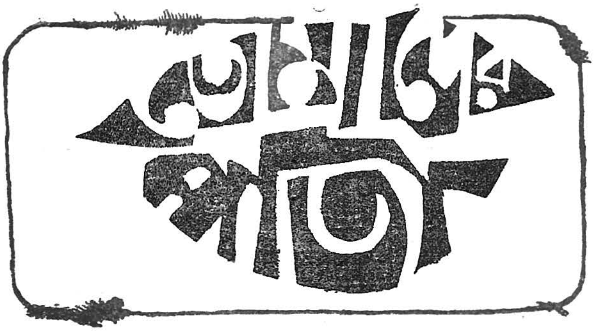
বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল কখন তা কেউ জানতে পারিনি। কিন্তু তার আর বিরাম নেই। সমানে পাঁচদিন অঝোরে বৃষ্টি হবার পর, শেষ পর্যন্ত জল ঝরা থামল। জলের চোটে এ'কদিন আমাদের কারো বাড়ির বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় নি। আকাশের ঘোর অনেকটা কেটে গেছিল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দু' একবার সূর্যের মুখও দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এই সব দেখে আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঐ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার সময় সেই সর্বনেশে গোলকটার কথা কারো মনে পড়ে নি। এবার আবার সেটা আকাশে দেখা দেবে, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এই ক'দিনে সেটা অনেক দূরে চলে গেছিল, সেজন্য সে তেজের কণাটুকুই শুধু থাকতে পারে, সে কথা ভেবেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম!

এর খানিক পরেই সেই মরণ-গোলকটা পাহাড়ের মাথার উপর থেকে উঁকি দিল। সবাই লক্ষ্য করলাম যে গোলকটার আয়তন অনেক ছোট হয়ে গেছে আর আগেকার সে তেজের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। এতদিনে আমাদের বিপদ যে সত্যি সত্যিই একেবারে কেটে গেছে, সেটা বুঝতে পেরে কি আনন্দ হ'ল যে কি বলবো।

আবহ আরেকটু পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি নিয়ে আমরা জনকয়েক বেরিয়ে পড়লাম। সামান্য একটু এগোতেই, কি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে সেটা নজরে পড়ল। গাছপালা সব ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। বৃষ্টির জলের তোড়ে এক এক জায়গায় জঞ্জালের স্তূপ এসে জড়ো হয়েছে, প্রায় সব পাহাড়ের গায়ে ভূমিকম্পের জের নজরে পড়ছে। অনেক জায়গায় হাইটেনসন ইলেকট্রিক তার নিয়ে যাবার উঁচু উঁচু পাইলনগুলো ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে। তার-ফার ছিঁড়ে একাকার হয়ে রয়েছে। সব নালা খানাখন্দ আর নিচু জমি বৃষ্টির জলে ভরা।

আমাদের ভাগ্যটা মন্দের ভালই বলতে হবে। কোনো বসতবাড়ির সে রকম ক্ষতি হয় নি। রাস্তাঘাট অবশ্য আবর্জনায় ভরা। ভাগ্যে এই রকম একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম, নইলে হাঁটা পথ ধরতে হ'ত। আর এই রকম রাস্তায় কতটুকুই-বা হাঁটতে পারতাম আর সময়ও লাগতো অফুরন্ত। এই বিশেষ ধরনের গাড়ি নিয়ে ও পথ দিয়ে এগোতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল আর সময়ও লাগছিল প্রচুর।

[চলবে]





অপর্ণিতা মিত্র

[বয়স-৫½]

রাণীর অতিথি

সমরেশ মণ্ডল

বেলজিয়ামের কোন একটি স্টেশন। প্লাটফর্মে গাদা গাদা সেপাই, সান্ত্রী, রাস্তায় মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। যাকে বলে হৈ-হৈ কাণ্ড। বেলজিয়ামের রাণীর অতিথি আসবেন। রাণীর হুকুম, কোন অসুবিধা যেন অতিথির না হয়।

যথাসময়ে ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকল। প্রত্যেক ফার্স্ট ক্লাস কামরার সামনে লোক মোতায়েন, নামা মাত্র অভ্যর্থনা জানানো হবে। ট্রেন প্লাটফর্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, তারপর প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। কেউ ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামলেন না! একটি একটি করে খুঁজলো সেপাই সান্ত্রীরা সারা প্লাটফর্ম। কোথাও রাণীর অতিথির মতো কাউকে দেখা গেল না। যাদের প্লাটফর্মে নামতে দেখা গেল তারা হলো তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হ'তে নামা কুলি মজুরদের দল আর একজন আধবুড়ো লোক। তার হাতে একটা বেহালা।

হতাশ মনে ফিরে গেল রাণীর চেলা চামুণ্ডারা। জানালো তারা, "ট্রেনে আপনার অতিথিকে দেখা গেল না।" আরো হতাশ হলেন রাণী। দুঃখিত হলেন। কিন্তু কোন কিছু মনে করলেন না। কারণ তাঁর অতিথি, যিনি আসবো বলেছিলেন, তিনি একজন বিজ্ঞানী। হয়তো কোন কাজে আটকে পড়েছেন। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ছাদের উপর বেড়াচ্ছিলেন রাণী। হঠাৎ ফটকের সামনে রাণী দেখ্‌তে পেলেন তাঁর অতিথি একজন সান্ত্রীর সঙ্গে কি সব কথা বলছেন। রাণী ছুটে গেলেন তাঁর অতিথির কাছে।

অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "আমি গাড়ি পাঠিয়েছিলাম স্টেশনে, তাতে না এসে হেঁটে এলেন কেন? এতটা পথ, ছিঃ ছিঃ আপনার কত কষ্ট হ'ল?"

অতিথি বললেন, আপনার লোক ছিল স্টেশনে? তা হবে। আমি কিন্তু লক্ষ্য করিনি তাছাড়া হাঁটতে হাঁটতে বেশ আরামে চলে এলাম! আমার কোন কষ্ট হয় নাই!

রাণী নিজে ডেকে নিয়ে গেলেন অতিথিকে প্রাসাদের মধ্যে। আর সান্ত্রীরা অবাক হয়ে দেখল যে, রাণীর অতিথি হলেন তিনি, তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হতে মজুরদের সঙ্গে যে আধবুড়ো লোকটি বেহালা হাতে নেমেছিলেন।

তোমরা জানো এই বিশিষ্ট অতিথি কে?

ইনিই হলেন সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক "আইনস্টাইন"।

ভাই বোন

সুবীর ঘোষ

দুটি বোন, তাহাদের মোটে এক ভাই;
হাসিখুশি গানে মজে থাকে যে সদাই।
ঘরের সীমার মাঝে বসায় আসর,
সুমধুর কলগানে ভরে থাকে ঘর।
পড়ে যায় গৃহমাঝে আহ্লাদ-হাট,
আঙিনাকে করে নেয় খেলিবার মাঠ।
সুমধুর ভাষ-বাসে আমোদিত গৃহ;
বিষাদ-বিষয়ে তারা সদা নিস্পৃহ।
শিশুদের ছুটোছুটি দেখে যে কী সুখ!
তাদের মেলায় গিয়ে খুশে ভরে বুক।
যেন তারা ছোট পাখি—সুখে মাতোয়ারা,
পৃথিবীতে শুধু খুশী দেখিয়াছে তারা।
কোন দুখ হিংসা ও বিষাদের লেশ
আসে নি হৃদয়ে মোটে। স্বার্থজ্ঞানরেশ
করে নি তাহাদেরে মোটে কলুষিত;
পৃথিবীর মধুরূপে তারা সদা প্রীত।
উহাদের এই রূপে কত সুখ পাই!
দেখিবারে পবিত্র সে মুখ; ছুটে যাই।

প্রভাতী

উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

[বয়স-১৩]

শোনো শোনো ওই প্রভাতীর গান,
হাতে ধরো আজ শাণিত কৃপাণ,
নাকাড়া বাজিতে দেরী নাই আর—
বাঁচাও গো সম্মান।
দেখো দেখো আজ শুয়ে আছে কারা
আজিকে দাও গো তাহাদের তাড়া।
করো সবে রণসজ্জা;
কৃপাণ ধরিয়া দুর করো আজ
আপন দেশের লজ্জা।
ভীরুতার পথে পিছিয়ো না আজ
করো করো সবে সাজ।
বীরের দর্পে হও আগুয়ান
শোনো প্রভাতীর গান।

রামায়ণের গল্প

রবিদাস সাহা রায়

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন,—দশরথের চার ছেলে যেন চারটি চাঁদের টুকরো। সোনার মত তাঁদের দেহের কান্তি, চাঁদের মত তাঁদের সুন্দর মুখ।

রাজকুমাররা দিন দিন যতই বড় হতে লাগলেন ততই তাঁদের রূপলাবণ্য বিকশিত হতে লাগলো।

চার ভাইয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন্ না। তার মধ্যে রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের এবং ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নের ভাবই খুব বেশী।

রাজকুমাররা বড় হলে রাজা যথাকালে তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। অসাধারণ তাঁদের মেধা শক্তি। অল্পকালের ভিতরেই তাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্র এমন আশ্চর্য ভাবে আয়ত্ত করতে লাগলেন যে সবাই অবাক হয়ে গেল।

রাজকুমাররা অস্ত্র বিদ্যাও শিক্ষা করতে লাগলেন।

বারো বছর বয়স হতে না হতেই রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন কি লেখাপড়া, কি অস্ত্রচালনা, কি রাজনীতি সব বিদ্যাতেই পারদর্শী হয়ে উঠলেন। দেশ জুড়ে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

একদিন রাজা দশরথ পাত্রমিত্রদের সঙ্গে রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় হঠাৎ মহামুনি বিশ্বামিত্র এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সকলের মন আতঙ্কে কেঁপে উঠলো। কারণ এই মুনি অতিশয় তেজস্বী। ক্ষত্রিয় হয়েও কঠোর তপস্যা বলে ব্রাহ্মণ হয়েছেন। দেবতারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করেন।

দশরথ মুনিকে যথাযোগ্য সমাদর করে আসনে বসালেন। তারপর সবিনয়ে বললেন—মুনিবর, আমার বড় সৌভাগ্য আপনি এসেছেন। আপনার আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

বিশ্বামিত্র বললেন—মহারাজ, রাক্ষসদের উপদ্রবে আমাদের যাগযজ্ঞ একেবারে বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। যজ্ঞ শুরু করলেই তাড়কা রাক্ষসীর দুই পুত্র মারীচ ও সুবাহু দলবল সহ এসে যজ্ঞ নষ্ট করে দেয়। ব্রাহ্মণদের পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। তাই তাদের বধ করবার জন্য আমি রামচন্দ্রকে নিতে এসেছি।

সে একা শুনে দশরথের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হলো। তিনি বললেন—মুনিবর, রামচন্দ্র নিতান্ত বালক। সে কি রাক্ষস বধ করতে পারবে?

বিশ্বামিত্র বললেন—মহারাজ, রামচন্দ্রের ক্ষমতার কথা আমি জানি। আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। দয়া করে তাকে আমার সঙ্গে দিন।

দশরথ আর আপত্তি করতে পরেলেন না। রামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্র যাত্রার উদ্যোগ করলেন। লক্ষ্মণ রামের বড় ভক্ত। এই দুই ভাই সব সময়ে এক সঙ্গে থাকেন। রাম মুনির সঙ্গে যাচ্ছেন শুনে সেখানে এসে হাজির হয়ে বললেন—বাবা, আমিও দাদার সঙ্গে যাবো।

দশরথ দেখলেন, দু'ভাই এই এক সঙ্গে থাকলে তবু তাদের মনের সাহস একটু বাড়বে। তাই কোন আপত্তি করলেন না। লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের সঙ্গী হলেন।

বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে সরযূ নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। পথশ্রমে বালক দুটির মুখ মলিন হয়ে পড়েছে। তা দেখে বিশ্বামিত্রের মনে খুব দুঃখ হলো। আহা রাজপুত্রদের তো এমন ভাবে পথ চলায় অভ্যাস নেই।

মুনিবর তখন রাম লক্ষ্মণকে 'বলা' ও 'অতিবলা' নামে দু'টি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। সেই আশ্চর্য মন্ত্রের এমনই শক্তি যে তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল, পরিশ্রমের কষ্টও লোপ পেল।

দু'ভাই তখন পরম উৎসাহে মুনির সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন এক গভীর বনের ধারে। সেই বনে ভয়ঙ্কর তাড়কা রাক্ষসীর বাস।

সেখানে এসে পৌঁছতেই মুনির বুক কেঁপে উঠলো। এমন সময় শোনা গেল বনের ভেতর ভীষণ শব্দ। সেই শব্দে পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বিরাট এক রাক্ষসী বন তোলপাড় করে তাঁদের দিকে ছুটে আসছে। মানুষ দেখতে পেয়ে বিরাট হাঁ করে সে সবাইকে গিলতে এলো। রাম তাকে এমন এক বাণ মারলেন যে সে আর এগিয়ে আসতে পারলো না।

তাড়কা রাক্ষসী তাতে ক্ষেপে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ তুলে রাম লক্ষ্মণকে মারতে এলো। রাম লক্ষ্মণ বান মেরে সেই গাছটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। তখন প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলে রাক্ষসী এগিয়ে এলো। রাম সেটিও বাণের আঘাতে চূর্ণ করলেন। এবার দু'পক্ষেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর রামচন্দ্র রাক্ষসীকে বধ করলেন।

এরপর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে নিজের তপোবনের দিকে যাত্রা করলেন।

পথে গৌতম মুনির আশ্রম। তাঁর পত্নী অহল্যা তাঁর অভিশাপে সেখানে পাষাণ হয়ে ছিলেন। রামচন্দ্রের পায়ের ছোঁয়া লাগতেই অভিশাপ মুক্ত হয়ে তিনি আবার জীবন্ত হয়ে উঠলেন।

এরপর আবার তাঁদের যাত্রা শুরু হলো। নদী পার হয়ে পর্বতের পাদদেশে গভীর অরণ্যে এক আশ্রমে এসে তাঁরা উপস্থিত হলেন। বিশ্বামিত্র বললেন—এই সেই পবিত্র আশ্রম যেখানে একদিন বামনরূপী বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই আশ্রমই এখন আমার সাধনার স্থল।

রাম লক্ষ্মণকে পেয়ে তপোবনের মুনিরা সকলেই খুশী। তাঁরা সকলে মহাধুমধামে আবার যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কিন্তু যজ্ঞের ধুম আকাশে উঠতেই দলে দলে রাক্ষসরা যজ্ঞ পণ্ড করবার জন্য ছুটে এলো।

যজ্ঞস্থলে এসে তাদের সে কী লম্ফঝম্প! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের লম্ফঝম্প বন্ধ হয়ে গেল। রাম লক্ষ্মণ সকলকেই বধ করলেন। তাড়কার পুত্র সুবাহু সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো মারীচ কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল লঙ্কার দিকে।

মুনিরা বহুকাল পরে আবার নিশ্চিন্ত মনে যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। রাম লক্ষণের প্রশংসায় ও জয়ধ্বনিতে সারা তপোবন মুখরিত হয়ে উঠলো।

নীলাকাশে প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তার

কমল চক্রবর্তী

ঘরের বারান্দায় একটি খাঁচা। তার মধ্যে একটি পাখী। পাখীটা বেরিয়ে আসতে চায় খাঁচার বাইরে। কিন্তু উপায় নেই, খাঁচার দরজা বন্ধ। দরজাটা খোলা থাকলে সে উড়ে বেড়াতো উন্মুক্ত নীলাকাশে। মাঝে মাঝে ভাব করতো অন্যান্য মুক্ত পাখীর সঙ্গে। পাখীটা শোভনদের বাড়ীতে এসেছে প্রায় এক বছর হ'ল। পাখীটার নাম বারো বছরের ছেলে শোভনের দেয়া। নামটা হ'ল টুনি। এই টুনি একটি বছর আগে ঘুরে বেড়াতো মনের আনন্দে। গাছের ডালে নেচে বেড়াতো, শিস্ দিয়ে গান গাইতো আর উড়ে বেড়াতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সেই দিন তার আজ ফুরিয়েছে। গানও তার আজকাল ভাল লাগে না। মনে যেন কত ব্যথা। যারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা বুঝবে না ওর দুঃখ।

এমনি করে কত দিন কেটে গেছে। শোভন এসে দেখেছে পাখীটাকে রোজ রোজ। পাখীটা যেন দিন দিন স্তব্ধ হয়ে আসছিল। শোভনের বুকেও দুঃখের অনুভূতি দেখা দিল। তারপর একদিন খাঁচা খুলে পাখীটা উড়তে উড়তে সেই যে চলে গেল আর ফিরে এল না। শোভন জানে মানুষও আজ উড়তে পারে আকাশে কিন্তু সে জানে না কেমন করে মানুষ প্রথমে আকাশে উড়তে শিখলো। তাই আকাশে ওড়ার গল্পটা শোভন ও তার বন্ধুদের জানা দরকার। সেই গল্পেতে এবার আসছি।

আকাশের দিকে তাকালে আমরা মাঝে মাঝে এরোপ্লেনের যাতায়াত দেখতে পাই। এছাড়া আজ আকাশ বিজয় করেছে কত রকেট, কত স্পুটনিক। আমেরিকা তো ১৯৭২ সালের মধ্যেই ছ'বার চাঁদে লোক পাঠিয়েছে। কিন্তু আকাশ বিজয়ের প্রথম ঘটনাগুলো খুবই আশ্চর্যজনক।

আকাশে ওঠবার প্রথম চেষ্টা করেন জার্মানীর এক পণ্ডিত লোক। নাম তার সোয়ার্জ। তিনি অ্যালু-মিনিয়াম ধাতু দিয়ে এক বেলুন তৈরী করেন। এই বেলুনের ভেতর গ্যাস ভর্তি করে রাখা হয়। এই বেলুনের সুবিধে হ'ল এর ভেতরের গ্যাস ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এই ধরনের বেলুন যথেষ্ট হালকা ধরনের হয়। বেলুন যে ধাতু দিয়ে তৈরী করা যায় এটা কেউই বিশ্বাস করেন নি। সোয়ার্জ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করে বহু বছর কঠোর পরিশ্রম করলেন এবং শেষে তিনি বেলুন তৈরী করলেন। পাখী যেমন ইচ্ছেমত উড়ে বেড়াতে পারে, তেমন করে বেলুনটাও যাতে উড়ে বেড়াতে পারে তার জন্য একটি স্ক্রুও তৈরী করলেন। কিন্তু পাখীর মত উড়ে বেড়ানোর ভাগ্য সোয়ার্জের হ'ল না। তিনি এই বেলুন তৈরীর কয়েক দিন পরেই মারা গেলেন। সোয়ার্জের এই আশা তখনকার মত শেষ হ'ল। আশাটা যেন খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে রইল!

কয়েক বছর পরে সোয়ার্জের স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাজকে সম্পূর্ণ করতে চাইলেন। তিনি জার্মান সরকারের কাছে বেলুন পরীক্ষার জন্য আবেদন করলেন। তাঁর ভাগ্য

সুপ্রসন্ন যে জার্মান সরকার তাঁর বেলুন পরীক্ষার জন্য যুদ্ধবিভাগের কয়েকজন অধ্যক্ষকে নিয়োগ করলেন। এই বেলুন আকাশে কেমন করে উড়বে সেটা দেখার জন্য একটা দিনও ঠিক করা হ'ল। পরীক্ষকেরা এসে দেখলেন এই বেলুনের সাইজ বিরাট এবং বেশ ভারী। এই বেলুনের সঙ্গে অনেক কল যোগ করা আছে। আর এতে আছে ইঞ্জিন এমন জিনিস যে আকাশে উঠতে পারবে এ আশা কেউই করলেন না বরং অনেকেই ব্যাপারটাকে পাগলামী বলে মনে করলেন। এক বিধবা এসেছেন এই বেলুনটাকে দেখাতে। তাই তাঁর আশা মেটানোর জন্যই পরীক্ষকেরা একটু-আধটু পরীক্ষার জন্য তৈরী হলেন। বেলুনটার গায়ে অনেক কল ও যন্ত্রপাতি থাকায় বেশ ভারী ছিল। তাই পরীক্ষকেরা বেলুনটাকে কিছু হালকা করতে চেয়ে অনেক কলকবজা কেটে ফেললেন কিন্তু তাঁরা জানতে পারলেন না যে সোয়ার্জের তৈরী এই কলগুলিই বেলুনটাকে বিভিন্ন দিকে চালাবার শক্তি রাখতো। বেলুনটা চালাতে দর্শকদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চালিয়ে দিলেন। সকলে দেখলেন বেলুনটা মাটি থেকে বিপুলবেগে শূন্যে উঠে গেল। কিন্তু অনেক গুলি কল কেটে ফেলায় বেলুনটা তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। এর থেকে বোঝা গেল সোয়ার্জের বেলুন মানুষকে আকাশপথে নিয়ে যেতে পারবে।

শোভনের পাখী যেমন তার পাখনায় ভর করে উড়ে গেছিল, ঠিক তেমন করে উড়ে বেড়াতে চেয়েছিলেন জার্মান দেশের আর একজন লোক। নাম তাঁর লিলিয়েনথাল। তিনি পাখীর পাখনার মত বিভিন্ন ধরনের পাখা তৈরী করলেন। এই পাখার দুটিকে নিয়ে বেশ মজবুত করে দুই হাতের সঙ্গে বেঁধে তিনি একটা পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিলেন। ঝাঁপ দেবার পর পাখা দুটোকে ভর করে নীচে নামলেন।

এরপর তিনি পাখার সংখ্যা বাড়িয়ে দেখলেন, এতে ওড়বার সুবিধে আরো অনেক বেশী। এইভাবে তিনি জীবনের ত্রিশ বছর বহু পরীক্ষা করলেন। তিনি অনেক কলও বানালেন। শেষবয়সে তিনি তাঁর কাজকে তাড়াতাড়িতে শেষ করতে চাইলেন। এতে তার তৈরী কল মজবুত হ'ল না। এই কল নিয়েই তিনি আবার শূন্যে উঠলেন। হঠাৎ বায়ুর এক প্রচণ্ড ঝাপটা এসে ওপরের একটা পাখা ভেঙ্গে দিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন ও প্রাণ হারালেন। কিন্তু বিজ্ঞানের সাফল্যকে আনতে বিভিন্ন লোকের প্রচেষ্টাগুলোকে হাতে হাত মেলাতে হয়েছে। তাই তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন মার্কিন দেশের এক অধ্যাপক। নাম তাঁর ল্যাঙ্গলি। তিনি পাখাযুক্ত ওড়বার কল তৈরী করলেন। তাতে খুব হালকা ইঞ্জিন যুক্ত ছিল। তিনি একবার তাঁর ইঞ্জিন নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। কিন্তু ইঞ্জিনের একটা স্ক্রু কর্মকারের অবহেলার দরুণ ঢিলে ছিল। এই ইঞ্জিন চালান হলে সেটা উড়ে আকাশে ঘুরতে লাগল এবং ঢিলে স্ক্রুটি খুলে যাওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যে কলটি নদীতে পড়ে গেল। এই কাজে বিফলতার জন্য ল্যাঙ্গলি অল্পদিনের মধ্যে মারা যান।

ল্যাঙ্গলির পর আকাশে ওড়বার চেষ্টা করেন উইলবার রাইট। তিনিও ছিলেন মার্কিনী। তিনি ল্যাঙ্গলির মত ওড়বার কল তৈরী করে পরীক্ষা করলেন। ওড়বার সময় একবার কল থেমে যাওয়ায় তাতে দুর্ঘটনার জন্য উইলবার রাইটের একখানা পা ভেঙে যায়। এরপরেও তিনি চেষ্টা করেন এবং সে চেষ্টায় সফল হন। এমনি করেই পাখীর মত মানুষও প্রথম আকাশে তার সাম্রাজ্যবিস্তার করতে চেষ্টা করেছে। বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে আজ যে সমস্ত আকাশযান আমরা দেখতে পাই তারা পাখীর চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। এই সব আকাশযানে করেই মানুষ দেশ-দেশান্তরে যেতে পারছে।



সোনার বাংলার রমনা থেকে

শাহরিয়ার কবির

বছর ঘুরে আবার একুশে ফেব্রুয়ারী এলো। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এ দিনটি যে কত পবিত্র আর গর্বের তা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। কেউ যদি কোন একুশে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় আসো তাহলে দেখতে পাবে এদেশের মানুষ কি আন্তরিক নিষ্ঠায় একটি বিশেষ দিনের স্মৃতিকে সযত্নে লালন করছে ; অতীতের সেই প্রতিবাদের পথ বেয়ে ভবিষ্যতের কোন প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে। একুশ যদি শুধু ইতিহাসের পাতায় একটি দিন হয়ে থাকতো তাহলে হয়তো কখনো এতখানি তাৎপর্যময় হয়ে উঠতো না। আসলে একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের কাছে শপথ নেবার দিন। বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার জন্যে যে কজন তরুণ ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, যে পথে বাষট্টিতে, ছেষট্টিতে, উনসত্তুরে আরএকাত্তরে শত সহস্র শহীদ অবিরাম রক্ত ঢেলেছেন, তিয়াত্তরের শুরুতেও যে রক্ত ঢালার বিরাম নেই, আমরা সেই সকল শহীদদের কথা স্মরণ করে অন্যায় অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে একুশের দিনে শপথ নিই। আমরা শপথ নেই আরো রক্ত ঢালার। তাই একুশ প্রতি বছরই আমাদের কাছে অম্লান, উজ্জ্বল শপথের দিন।

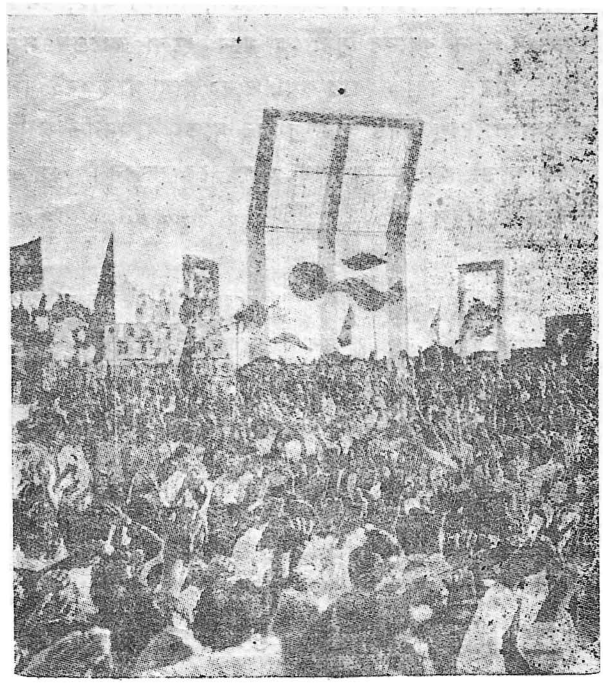
পাকিস্তানী শাসকরা ঠিকই বুঝেছিল প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারের বেদীমূলে যে শপথ এতদিন নেয়া হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই তারা পঁচিশে মার্চের রাতেই মেডিকেল কলেজের সামনের বিশাল শহীদ মিনারটি কামানের ভারি গোলায় মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। শহীদ মিনারকে ভীষণ ভয় পেতো পশ্চিমা শাসকের দল। শুধু একাত্তরের মার্চেই ওরা প্রথম শহীদ মিনার ভাঙেনি। ভেঙেছিল বায়ান্ন সালের শহীদ মিনারও। এদেশের একজন কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ তখন লিখেছিলেন—

"স্মৃতির মিনার ভেঙেছ তোমরা
ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো, ভিত কখনো
কোন রাজন্য ভাঙতে পারেনি।"

তখন চার কোটি পরিবার সাতান্ন সালে আবার গড়েছিল বিশাল শহীদ মিনার। একাত্তরে ওরা যে শহীদ

মিনার ভাঙলো, তিয়াত্তরে সাড়ে সাত কোটি পরিবার মিলে রাতারাতি গড়ে তুললো আগেকার সেই শহীদ মিনারকে।

শাসক গোষ্ঠীর বোঝা উচিত শহীদ মিনার ভেঙে কোন অধিকারের, প্রতিবাদের অথবা সংগ্রামের দাবীকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। চার কোটি, সাড়ে সাত কোটি হয়ে যেমন প্রতিবাদ করেছে, কে জানে এই সাড়ে সাত কোটি আবার দশ কোটিতে পরিণত হয়ে নতুন কোন সংগ্রামের আগুন জ্বালবে।



স্মৃতির মিনার…কোন রাজন্য ভাঙতে পারেনি

আজ ফাল্গুনের পনেরো তারিখ। সারা দেশের ওপর এক ঝলক ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে নেমে এসেছে শ্রাবণের বৃষ্টি। ন্যাড়া গাছ, ধূসর মাঠ সজীব হয়ে উঠেছে। রমনার মাঠে বিচিত্র সবুজের উজ্জ্বল মেলা বসে গেছে। এক একটি গাছের সবুজ এক এক রকম। কদিন ভ্যাপসা গরমের পর বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সবাই বলছে ফসলের জন্যে এই বৃষ্টির খুবই দরকার ছিল। এমনিতে গত বছর অনাবৃষ্টির জন্যে ভালো ফসল হয়নি। বিদেশী বন্ধুদের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে না পেলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো কঠিন হতো। বিদেশী এই বন্ধু দেশগুলোর ভেতর ভারতের স্থান অবশ্যই সবার ওপরে।

বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে। আর মাত্র আট দিন বাকি। তোমরা যখন এ লেখা পড়বে তদ্দিনে নিশ্চয়ই নির্বাচন হয়ে যাবে। সবাই আশা করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আর তাঁর দল আগের মতোই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠে জিতে যাবে। বঙ্গবন্ধু নিজে চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। এর দুটো আসনে ইতিমধ্যেই তিনি জয়ী হয়ে বসে আছেন। কারণ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এ দুটো আসনে হয় প্রার্থী দাঁড় করায় নি, নয় তাদের প্রার্থী কোন কারণে বাতিল হয়ে গেছে। অল্প কিছু আসন ন্যাপ আর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল পেতে পারে। যাকগে ওসব, এ মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। কারণ তোমরা এ লেখা পড়ার আগেই নির্বাচনের খবর জেনে যাবে। অবশ্য যারা রাজনীতিতে উৎসাহী।

তবে যাই বলো, বাংলাদেশের কিশোরদের চেয়ে পশ্চিম বাংলার কিশোররা রাজনীতিতে ঢের বেশী উৎসাহী। আমি কোলকাতার দিগন্ত বসু আর সুমন্ত বসুকে চিনি, যাদের বয়স নয় থেকে বারোর ভেতর।

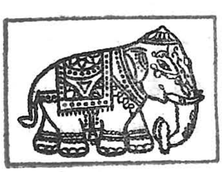
আমাকে অবাক করে দিয়ে ওরা কংগ্রেস, সি পি আই, সি পি এম, এসব দলের রাজনীতি গড়গড় করে বলে দিয়েছিল। ন বছরের সুমন্তকে মনে হলো কংগ্রেস সমর্থন করে, আর বারো বছরের দিগন্ত সি পি-এম। আরও অবাক হবার কথা, ওদের বাবা মা দুজনই সি-পি-আইর সমর্থক। আমি হলফ করে বলতে পারি সারা বাংলাদেশে দিগন্ত আর সুমন্তর মতো রাজনীতি জানিয়ে ছেলে একটিও খুঁজে পাবে না। কোলকাতায় ওদের মতো আরো যে কত আছে কে জানে। এমনিতে ওরা দুজন মিলেই আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিয়েছিল।

তবে হ্যাঁ, রাজনীতি না জানলেও সাহিত্য সংস্কৃতি এ সব ব্যাপারে এদেশের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে নেই। চট্টগ্রামের স্বাতী নামের দশ বছরের সেই মেয়েটার কথাই ধরো না, যে একবার আমাকে এদেশের শিশু সাহিত্য সম্পর্কে কয়েক ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে ঠিক বুঝিয়ে দিলো, আমাদের শিশু সাহিত্যের মান দুঃখজনক ভাবে কমে গেছে। বুড়োরা একেবারেই লিখতে পারছেন না আর দু একটা যাও লিখছেন পড়ার মতো নয়। ওর ভারি দুঃখ এদেশে লীলা মজুমদার শিবরাম চক্রবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো একজন লেখকও নেই। তরুণ লেখকদের কয়েকজনের লেখা ওর যদিও ভালো লাগে তবু সমালোচক হিসেবে ও মনে করে এদের লেখা আরো ভালো হওয়া উচিত। এরা মানে আলী ইমাম, মুনতাসির, ইফতেখার হোসেন আর আহমদ আনিসুর রহমানের মতো লেখকরা।

স্বাতীর পাকা পাকা কথা শুনে আমি ওকে বলেছিলাম, তুমি কেন লেখো না স্বাতী। কেউ যখন লিখতে পারছে না তখন তোমার লেখা উচিত। আমার কথার জবাব অবশ্য স্বাতী দেয়নি। কারণ ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ায় ও আমার সামনে থেকে উঠে চলে গিয়েছিল।

আগামীতে কখনো তোমাদের বাংলা দেশের শিশু ও কিশোর সাহিত্য সম্পর্কে বলবো, যদি তোমরা কেউ স্বাতীর মতো সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক ও সমালোচক হও।

আজ এই থাক। সকলের জন্যে শুভেচ্ছা রইলো।





ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

এখন গাছে গাছে কোকিল ডাকছে! দু'এক পশলা বৃষ্টিতে সবুজ হয়ে উঠেছে খেলার মাঠ! এম.সি.সি. ক্রিকেট দল বিদায় নিয়েছে এ দেশ থেকে! আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিকেটের মরসুম শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেছে ফুটবলের তোড়জোড়; এমনকি তোমাদের হাতে যখন 'রোশনাই'-এর এই সংখ্যা গিয়ে পৌঁছোবে তখন কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদল করার শেষ দিনও পার হয়ে গেছে! পরবর্তী সংখ্যায় তাই কোন্ ফুটবল দল কতটা শক্তিশালী হ'ল এবং নামী-দামী কোন্ কোন্ খেলোয়াড় জার্সি বদল করলো তার একটা বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। আপাতত এই সংখ্যায় খেলাধূলা সম্পর্কে তোমাদের সাধারণ জ্ঞান কার কতটা সেটা পরীক্ষা করে দেখা যাক্। নীচে খেলাধূলা সম্পর্কে কুড়িটা প্রশ্ন দেওয়া হ'ল। এই প্রশ্নগুলির তলায় তিনটে করে উত্তর দেওয়া আছে। আবার এই তিনটে উত্তরের মধ্যে একটা ঠিক, আর বাকি দুটো ভুল; এখন তোমাদের মাথা খাটিয়ে প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক জবাবটা বেছে নিতে হবে। কে কতগুলো প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারো তাই দেখে নির্ধারণ করা হবে খেলাধূলা সম্পর্কে তোমাদের সাধারণ জ্ঞানের দৌড়। সব কিছুর শেষে উলটো ভাবে লিখে দেওয়া হ'ল সঠিক জবাবগুলো। তোমরা এখন নিজেদের জবাবগুলো মিলিয়ে নাও ঐ সমাধানে সঙ্গে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে পাবে এক নম্বর; এখন যদি ষোল বা তার বেশি নম্বর পাও তবে জানবে তোমার সাধারণ জ্ঞান চমৎকার (excellent); আর যদি বারো থেকে পনেরোর মধ্যে নম্বর পাও তবে বলবো বেশ ভালো (good); আবার নয় থেকে এগারোর মধ্যে নম্বর পেলে তাকে বলা যাবে মোটামুটি ভালো (fair); এর নীচে যদি কেউ নম্বর পাও তবে জানবে খেলাধূলা সম্পর্কে তার আরও বেশী খোঁজ খবর রাখা দরকার! এখন তোমরা কে কত নম্বর পেলে আমাদের জানাতে ভুলো না।

খেলাধূলার সাধারণ জ্ঞান

(সঠিক জবাবের নীচে দাগ দাও)　　　মোট নম্বর ঃ ২০

১) প্রশ্ন ঃ—একটি ফুটবল বলের ওজন ও পরিধি কত হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ—[ক] ১৪ আউন্স থেকে ১৬ আউন্সের মধ্যে (ওজন) এবং ২৭" থেকে ২৮"-এর মধ্যে (পরিধি) [খ] ২০ আউন্স থেকে ২৩ আউন্স এবং ২৫" থেকে ২৬"-এর মধ্যে [গ] ১৯ আউন্স থেকে ২১ আউন্স এবং ২৪" থেকে ২৫"-এর মধ্যে।

২) প্রশ্ন ঃ—একটি টেব্‌ল টেনিস বোর্ড কতটা লম্বা এবং কতটা চওড়া ?

উত্তর ঃ—[ক] ১২ফুট লম্বা, ৭ ফুট চওড়া [খ] ৯ ফুট লম্বা ৫ ফুট চওড়া [গ] ১০ ফুট লম্বা ৫ফুট চওড়া।

৩) প্রশ্ন ঃ—একটি হকি স্টিকের ওজন কত হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ—[ক] ১০ থেকে ১৫ আউন্সের মধ্যে [খ] ১৮ থেকে ২৬ আউন্সের মধ্যে [গ] ১২ থেকে ২৮ আউন্সের মধ্যে।

৪) প্রশ্ন ঃ—হকি খেলায় এক এক দলে কতজন করে খেলোয়াড় থাকেন ?

উত্তর ঃ—[ক] ৯ জন [খ] ১১ জন [গ] ৭ জন

৫) প্রশ্ন ঃ—বেসবল খেলায় এক এক দলে ক'জন খেলোয়াড় থাকেন ?

উত্তর ঃ—[ক] ১১ জন [খ] ৯ জন [গ] ১৩ জন

৬) প্রশ্ন ঃ—বাস্কেট বল খেলায় এক এক দলে কজন খেলোয়াড় থাকেন ?

উত্তর ঃ—[ক] ৯ জন [খ] ৭ জন [গ] ৫ জন

৭) প্রশ্ন ঃ—কবাডি খেলায় এক এক দলে কজন খেলোয়াড় থাকেন ?

উত্তর ঃ—[ক] ৬ জন [খ] ৭ জন [গ] ৫ জন

৮) প্রশ্ন ঃ—ফুটবল নামকরণের আগে এই খেলা আর কি নামে প্রচলিত ছিল ?

উত্তর ঃ—[ক] ফলিস্ [খ] খো-খো [গ] কার্লিং

৯) প্রশ্ন ঃ—ভারতের সবচেয়ে পুরানো ফুটবল ক্লাবের নাম কি ?

উত্তর ঃ—[ক] মোহনবাগান [খ] ডালহাউসী [গ] স্পোর্টিং ইউনিয়ন

১০) প্রশ্ন ঃ—ভারতের প্রথম ফুটবল খেলা হয় কত সালে ?

উত্তর ঃ—[ক] ১৭৫৭ সালে [খ] ১৮২১ সালে [গ] ১৯১১ সালে

১১) প্রশ্ন ঃ—ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা কে প্রথম প্রবর্তন করেন ?

উত্তর ঃ—[ক] স্যার জামসেদজী টাটা [খ] স্যার হেনরী মর্টিমোর ডুরাণ্ড [গ] স্যার লেসলী মর্টিমোর ডুরাণ্ড।

১২) প্রশ্ন ঃ—আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতায় সর্ব প্রথম কোন দল জয়লাভ করে ?

উত্তর ঃ—[ক] ইটোনিয়ান্স [খ] রয়েল আইরিস রাইফেল [গ] ডালহৌসী

১৩) প্রশ্ন :—ভারতীয় দল হিসাবে আই. এফ. গতায় সর্বপ্রথম কোন দল জয়লাভ করে ?

উত্তর :—[ক] ইস্টবেঙ্গল [খ] শোভাবাজ মোহনবাগান

১৪) প্রশ্ন :—রোভার্স ফুটবল প্রতিযোগিতা ভারতের রে অনুষ্ঠিত হয় ?

উত্তর :—[ক] দিল্লী [খ] বোম্বাই [গ] হায়দ্র।

১৫) প্রশ্ন :—কোন খেলোয়াড়কে বলা হয় "হকির জাদুকর ?

উত্তর :—[ক] রামচাঁদ [খ] ধ্যানচাঁদ [গ] বলবীর সিং

১৬) প্রশ্ন :—ভারতের সবচেয়ে পুরানো ক্রিকেট ক্লাবের নাম কি ?

উত্তর :—[ক] মোহনবাগান [খ] বোম্বাই জিমখানা [গ] ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব

১৭) প্রশ্ন :—ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত কে সবচেয়ে বেশিবার সেঞ্চুরী করতে পেরেছেন ?

উত্তর :—[ক] ব্রাডম্যান [খ] জে. বি. হবস [গ] লেন হাটন্

১৮) প্রশ্ন :—ওলিম্পিক খেলাধূলা প্রথম শুরু হয়েছিল কোন দেশে ?

উত্তর :—[ক] গ্রীসে [খ] জার্মানীতে [গ] রোমে

১৯) প্রশ্ন :—দাবা খেলার জন্ম কোন দেশে ?

উত্তর :—[ক] রাশিয়ায় [খ] ভারতে [গ] আরব দেশে

২০) প্রশ্ন :—ভারতীয় হকিদল কোন বছর প্রথম ওলিম্পিক-স্বর্ণপদক লাভ করে ?

উত্তর :—[ক] ১৯২৮ সালে [খ] ১৮০৫ সালে [গ] ১৯৪৭সালে

জবাব

ক ২) খ ৩) গ ৪) খ ৫) খ ৬) গ ৭) খ ৮) ক ৯) খ ১০) খ ১১) খ ১২) খ ১৩) গ

) গ ১৭) খ ১৮) ক ১৯) খ ২০) ক

সঠিক উত্তর দিতে পারলে পাওয়া যাবে ১ নম্বর ; আর ১৬—২০ এর মধ্যে নম্বর পেলে সাধারণ ১২—১৫ পেলে বেশ ভালো, ৯— ১১ পেলে মোটামুটি ভালো। এখন নিজেই পরীক্ষার ফলাফল র করে দেখো।]

মগজধাঁধা

১. তাস সাজাও

একটি ছেলে চার সারিতে কতগুলো তাস সাজাে প্রত্যেক সারিতে আগের সারির চেয়ে ১টি করে ে তাস ছিল। এবং সব তাস সাজানোর পর দেখা গেল চতুর্থ সারিতে প্রথম সারির দ্বিগুণ তাস আছে।

বলতে পারো, সব সুদ্ধ কটা তাস সে সাজিয়ে ছিল ?

২. হারানো শব্দ

নিচের প্রতিটি বাক্যে দুটি করে তিন অক্ষরের শব্দ হারিয়ে গেছে! হারানো দ্বিতীয়টি প্রথম শব্দটির শুধু মাথার শব্দটি পাল্টে দিলেই পাওয়া যাবে।

যেমন: আকাশে—শুনে ভ্রমণটা—করলাম। উত্তর গর্জন ; বর্জন ;

এবার নিচের হারানো শব্দগুলো খুঁজে বার করো।

ক) আজ—থেকেই—হচ্ছি

খ) —পেয়েছ নাকি, যে এ রকম—হাতে বিলিয়ে যাচ্ছ ?

গ) আজ—অনুষ্ঠানে রমার—আছে।

ঘ) শুধু—দিয়ে ক্ষুধার্তকে—করা যায় না।

৩. খুকুর বয়স

খুকু বলল, তিন বছর পর, আমার তিন বছর আগে যা বয়স ছিল তার তিন গুণ বয়স হবে।

খুকুর এখন বয়স কত ?

৪. বঁড়শির মাপ

একটি দোকানে বিক্রির জন্য চারটি বিভিন্ন মাপের মাছ ধরার ছিপ দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রতিটি ছিপ অন্যটির চেয়ে দুই ফুট করে লম্বা। সবচেয়ে বড়টি সবচেয়ে ছোটটির চারগুণ লম্বা ছিল।

সবচেয়ে লম্বাটির মাপ বলতো ?

৫. সম্পর্কিত শব্দ

১. অ বা দী ব হি কা ন

২. গ জা জ র সা হা

৩. আ ল তা শ পা কা

প্রতিটি লাইনে যে অক্ষরগুলো বেছে নিলে একটি শব্দ হয় সেই অক্ষরগুলো কেটে দাও। দেখবে বাকী অক্ষরগুলো ঠিক মত সাজিয়ে নিলে আর একটি শব্দ পেয়ে যাবে। এবং শব্দ দুটো কোন না কোন ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত।

(যেমন: 'কি র কি শো শো রী' থেকে পাচ্ছো—কিশোর কিশোরী)

৬. ভ্রমস্বীকার

মল লেজে লহ রে

উপরের শব্দ চারটির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ছাপাখানার ভুলে বাদ পড়ে গেছে। বের করে শব্দ চারটির সঙ্গে যোগ ক. পংক্তি পেয়ে যাবে।

বলো তো বর্ণটি কি ?

উঃ ১৮ (৩+৪+৫+৬)

উত্তর—সকাল, নাকাল। স্বরাজ, দরাজ। বেতার, সেতার। ভাষণ, তোষণ।

উত্তর—৬ বছর

উত্তর: ৮ ফুট

উত্তর: নদী, অববাহিকা, সাগর, জাহাজ, আকাশ, ...ল

উত্তর—ক